আমাদের ভাষাসমস্যা

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ (১৯১৭)

১৩২৪ সালে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মিলনীর দ্বিতীয় অধিবেশনের সভাপতি হিসাবে কলকাতায় দেয়া ভাষণ।]

আমরা বঙ্গদেশবাসী। আমাদের কথাবার্তার, ভয়-ভালবাসার, চিন্তা-কল্পনার ভাষা বাংলা। তাই আমাদের মাতৃভাষা বাংলা। দুঃখের বিষয়, জ্যামিতির স্বতঃসিদ্ধের ন্যায় এই সোজা কথাটীকেও আমাদের মধ্যে এক সম্প্রদায়কে বুঝাইয়া দিলেও তাঁহারা জোর করিয়া বুঝিতে চাহেন না। তাই মধ্যে মধ্যে আমাদের মাতৃভাষা কি কিংবা কি হইবে, তাহার আলোচনা সাময়িক পত্রিকাদিতে দেখিতে পাওয়া যায়। হা আমাদের সূক্ষ্ম বুদ্ধি।

মাতৃভাষা ব্যতীত আর কোন ভাষা কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া পরাণ আকুল করে? মাতৃভাষা ব্যতীত আর কোন ভাষার ধ্বনির জন্য প্রবাসীর কান পিয়াসী থাকে? মাতৃভাষা ব্যতীত আর কোন ভাষায় কল্পনা-সুন্দরী তাহার মনমজান ভাবের ছবি আঁকে? কাহার হৃদয় এত পাষাণ যে মাতৃভাষার অনুরাগ তাহাতে জাগে না? পৃথিবীর ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখ মাতৃভাষার উন্নতি ব্যতীত কোনও জাতি কখনও কি বড় হইতে পারিয়াছে? আরব পারস্যকে জয় করিয়াছিল। পারস্য আরবের ধর্ম্মের নিকট মাথা নীচু করিয়াছিল, কিন্তু আরবের ভাষা লয় নাই; শুধু লইয়াছিল তাহার ধর্মভাব আর কতকগুলি শব্দ। তাই আনোয়ারী, ফারদৌসী, সাদী, হাফিয, নিযামী, জামী, সানাই, রুমী প্রমুখ কবি ও সাধক-বুলবুল কুলের কলতানে আজ ঈরানের কুঞ্জ-কানন মুখরিত। যে দিন ওয়াইক্লিফ লাটিন ছাড়িয়া ইংরেজী ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ করিলেন, সেই দিন ইংরেজের ভাগ্যলক্ষ্মী সুপ্রসন্ন হইল। যতদিন পর্য্যন্ত জর্ম্মানিতে জর্ম্মান ভাষা অসভ্য ভাষা বলিয়া পরিগণিত ছিল, তত দিন পর্য্যন্ত জর্ম্মানির জাতীয় জীবনের বিকাশ হয় নাই। বেশী দূর যাইতে হইবে না। আমাদেরই প্রতিবেশী আমাদের হিন্দুস্থানী মুসলমান ভাইগণ সংখ্যায় এত অল্প হইয়াও এত উন্নত কেন? আর আমরা সংখ্যায় এত বেশী হইয়াও এত অবনত কেন? ইহার একমাত্র কারণ তাঁহারা মাতৃভাষার প্রতি অনুরক্ত আর আমরা মাতৃভাষার প্রতি বিরক্ত। হিন্দুস্থানী আলিমগণ উর্দুভাষায় কুরআন শরীফের অনুবাদ এবং তফসীর, ফিক্‌হ, হদীস, তসউউফ, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান, ভ্রমণ-বৃত্তান্ত, কাব্য, উপন্যাস প্রভৃতি বিষয়ে বহু মৌলিক গ্রন্থ রচনা করিয়া কিংবা এতদ্বিষয়ক আরবী, পারসী ও ইংরাজি প্রভৃতি ভাষার গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশ করিয়া উর্দু ভাষায় সর্বাঙ্গসুন্দর ইসলামী সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু দুই চার জন বিশিষ্ট ব্যক্তি ব্যতীত আমাদের মৌলভী মৌলানাগণ বঙ্গ ভাষায় গ্রন্থ রচনা করা দূরে থাকুক বঙ্গভাষা কাফেরী ভাষা, তাহাতে ধর্মগ্রন্থের অনুবাদ করিলে ধর্মগ্রন্থের অমর্য্যাদা করা হয় ইত্যাদি রূপ প্রলাপ উক্তি করিতে ছাড়েন না। বিশুদ্ধরূপে বাংলা বলা বা লেখা তাঁহারা নিন্দাজনক মনে করেন। ফলে তাঁহাদের ধর্ম্মবিষয়ক বক্তৃতা শুনিয়া সামান্য বাংলা-জানা শ্রোতারা পর্য্যন্ত হাসিবে কি কাঁদিবে, তাহা ঠিক করিতে পারে না। তাঁহাদের বাংলা ভাষায়

যেমন দখল, উদ্ধৃতিও তেমন। স্কুলের ন্যায় যে পর্য্যন্ত বাংলার মাদ্রাসাতেও বাংলা ভাষা অবশ্যপাঠ্য দেশীয় ভাষারূপে স্থান না পাইবে, সে পর্য্যন্ত আমাদের এ দুরবস্থা ঘুচিবে না। যে পর্য্যন্ত আরবী-পারসী-জানা মুসলমান লেখক বাংলা ভাষার সেবায় কলম না ধরিবেন, সে পর্য্যন্ত কিছুতেই বঙ্গীয়-মুসলমান-সাহিত্য গঠিত হইবে না। সে দিন অতি নিকট, যে দিন বাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ভাষার স্থান অধিকার করিবে। বিদেশীয় ভাষার সাহায্যে জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চ্চার ঘতন সৃষ্টিছাড়া প্রথা কখনও টিকিতে পারে না।

মুসলমান ছাত্রের পক্ষে কোন classical language লওয়া উচিত, ইহার উত্তরে প্রত্যেক মুসলমান এক বাক্যে বলিতে বাধ্য হইবেন আরবী। আল্লাহর শেষ প্রত্যাদেশ আরবীতে। আল্লাহর শেষ নবী আরবী। আমরা সেই নবীর উম্মত (মণ্ডলী), সেই শেষ প্রত্যাদেশের উত্তরাধিকারী। অনুবাদে মূলের ছায়া পাওয়া যায় মাত্র; মূলের প্রাণ অনুবাদে থাকিতে পারে না। যদি ইসলাম ধর্ম্মকে তাহার প্রাথমিক যুগের অনাবিল অবস্থায় বজায় রাখা আবশ্যক বলিয়া মনে হয়, যদি শত দেশভেদ এবং সহস্র ভাষাভেদ সত্বেও ইসলামের ভ্রাতৃত্বের বন্ধন অক্ষুন্ন রাখা কর্তব্য বলিয়া মনে হয়, তবে মুসলমানকে তাহার কুরআন হদীস মূল ভাষায় পড়িতে হইবে, পড়িয়া বুঝিতে হইবে, বুঝিয়া মজিতে হইবে। যদি মরুকে নগর করিবার, পশুকে মানুষ করিবার, অন্ধকে চক্ষুষ্মান করিবার, কাঙ্গালকে আমীর করিবার, ভীরুকে বীর করিবার অমোঘ মন্ত্র শিখিতে চাও, তবে আরবী কুরআন শিখ। যেমন প্রত্যেক খ্রীষ্টান বালক তাহার বাইবেল জানে, যে পর্য্যন্ত প্রত্যেক মুসলমান বালক তেমনই তাহার কুরআন শরীফকে না জানিবে, সে পর্য্যন্ত মুসলমান সমাজ জাগিবে না। সমস্ত জগতের বদলে যে মুসলমান তাহার কুরআন ছাড়িতে প্রস্তুত ছিল না, আজ দেখ, সেই মুসলমান সন্তান সংস্কৃত, পারসী, উর্দু কিংবা পালি ভাষার বিনিময়ে কিরূপে তাহার কুরআনকে বর্জন করিতেছে। হা ধিক্ আমাদের মৌখিক ধর্ম্মানুরাগকে। হা ধিক্ আমাদের দুনিয়া-পূজাকে। আমি বলিন মুসলমান কূপমণ্ডুক হইয়া কেবল আরবী সাহিত্যই আলোচনা করিবে। জগতের জ্ঞান ভাণ্ডার মুসলমানেরই জন্য। ধর্মগুরু এইরূপ বলিয়াছেন যে, “বিজ্ঞান মুসলমানের হারান ধন, যেখানে পাও তাহাকে গ্রহণ কর।” পুনশ্চ, “জ্ঞান অনুসন্ধান কর, যদিও তাহা চীন দেশে হয়।” আমি শুধু এইটুকু বলিতে চাই, আগে ঘরের খবর জান, পরে পরের খবর জানিও।

স্কুলের ন্যায় মাদ্রাসাতেও মাতৃভাষা, প্রধান ভাষা ও দ্বিতীয় ভাষা এই তিন ভাষার চর্চ্চা হইবে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য, দ্বিতীয় ভাষা কি হওয়া উচিত? আমি বলি ইংরেজী। ইংরেজী ভাষার সাহায্যে আমাদের মৌলভী সাহেবগণ আধুনিক দর্শন, বিজ্ঞানের তত্ব পাইবেন। যদি আমাদের আলিমকুল কুফুরী ফতয়ারূপ প্রচণ্ড দণ্ড দ্বারা আমাদের ইংরেজী শিক্ষিত সমাজকে ভীতচকিত ও দলিতমথিত করিয়া ইসলামের অপ্রতিহত ক্ষমতার পরিচয় দিতে না গিয়া, বাস্তবিক তাহাদের হৃদয়রাজ্যে ভক্তির আসন লাভ করিতে চান। যদি তাঁহারা ক্রমবর্ধনশীল শিক্ষিত সমাজকে ইসলামের গণ্ডী হইতে খারিজ করিয়া না দিয়া তাহাদের প্রকৃত ধর্ম্মোপদেশক হইতে চান, তবে তাহাদিগকে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানে পরিপক্ক হইতেই হইবে। পৃথিবী সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে বলিলে যাঁহাদের মতে অতি ভাল মুসলমানও কাফের হইয়া যায়; পৃথিবী মাছের পিঠে আছে, পৃথিবী চারিদিকে কাফ পাহাড় দিয়া ঘেরা ইত্যাদিরূপ বালকোচিত মত

যাঁহারা আজও গম্ভীরভাবে প্রচার করেন, তাঁহাদিগকে তাঁহাদের সমস্ত ধার্ম্মিকতা সত্ত্বেও শিক্ষিত সমাজ ভক্তি করিতে অক্ষম।

স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা সর্বত্রই উর্দু বা পারসী বৈকল্পিক বিষয় (optional subject) থাকিলে মুসলমান ছাত্রগণের ভাষা সমস্যার সমাধান হয়। যাহাতে উর্দু বা পারসী বৈকল্পিক বিষয় হইতে পারে, তজ্জন্য আমাদিগকে শিক্ষাবিভাগের কর্তৃপক্ষগণকে সম্মত করাইতে হইবে।

অনেক দিন পূর্ব্বে উর্দু বনাম বাংলা মোকদ্দমা বাংলার মুসলমান সমাজের ভিতরে উঠিয়াছিল, তাহাতে বাংলার ডিক্রী হইয়া মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইয়া যায়। বর্তমানে আবার সেই মোকদ্দমার ছানি বিচারের জন্য উর্দুপক্ষকে বিস্তর সওয়াল জওয়াব করিতে শুনিতেছি। কিন্তু ন্যায়বান বিচারক দেখিবেন যে উর্দু বাংলার দখল উত্যক্তে কিছুতেই খাস দখল পাইতে পারে না; দখল বাংলারই থাকিবে, তবে উর্দু বাংলার অধীনে উপযুক্ত করে ইচ্ছাধীন প্রজাই স্বত্বে কিছু ভূমি বন্দোবস্ত পাইতে পারে মাত্র।

বাংলা ভাষা চাই-ই। মুহম্মদ-ই বখতিয়ারের বাংলা জয়ের পরে যখন হইতে মুসলমান বুঝিল এই চির-হরিতা ফলশস্য-পুরিতা নদ-নদী-ভূষিতা বঙ্গভূমি শুধু জয় করিয়া ফেলিয়া যাইবার জিনিস নহে; এ দেশ কর্ম্মের জন্য, এ দেশ ভোগের জন্য, এ দেশ জীবনের জন্য, এ দেশ মরণের জন্য, তখন হইতে মুসলমান জানিয়াছে বাংলা চাই-ই। তাই বাংলার পাঠান বাদশাহগণ বাংলা ভাষাকে আদর করিতে লাগিলেন। যে ভাষা দেশের উচ্চ শ্রেণীর অবজ্ঞাত ছিল, তাহা বাদশাহের দরবারে ঠাঁই পাইল। নসরৎ শাহ, হোসেন শাহ, পরাগল খাঁ, ছুটি খার নাম বাঙ্গালী ভুলিতে পারিবে না। বাদশাহের দেখাদেখি আমীর ওমরা বাংলার খাতির করিলেন। আমীর ওমরার দেখাদেখি সাধারণে বাংলার আদর করিল। গোঁড়া ব্রাহ্মণের অভিসম্পাত ও চোখরাঙ্গানিকে ভয় না করিয়া বাঙ্গালী নবীন উৎসাহে তাহার প্রিয় ধর্ম্মপুস্তকগুলি বাংলায় অনুবাদ করিল, কত দেশ প্রচলিত ধর্ম্মকথা বাংলায় প্রকাশ করিল, কত মর্ম্মগাথা বাংলায় প্রচার করিল। মুসলমানও চুপ করিয়া থাকে নাই। হিন্দুর রামায়ণ আছে; মুসলমানের "জঙ্গনামা" আছে। হিন্দুর মহাভারত আছে, মুসলমানের "কাসাসোল আম্বিয়া" আছে। হিন্দুর মহাজন পদাবলী আছে; মুসলমানের মারফতী গান আছে। হিন্দুর বিদ্যাসুন্দর আছে; মুসলমানের "পদ্মাবতী" আছে।

যেমন রাজনীতিক্ষেত্রে অভিজাততন্ত্র (Aristocracy) এবং গণতন্ত্র (Democracy) আছে, ভাষাক্ষেত্রেও তদ্রূপ অভিজাততন্ত্র ও গণতন্ত্র আছে। ভারতীয় ভাষা হইতে আমি ইহার উদাহরণ দিতেছি। যে সময় ঋষিগণের মধ্যে বৈদিক ভাষা প্রচলিত ছিল, সেই সময় সাধারণ আর্য্যগণের মধ্যে বৈদিক হইতে কিছু বিভিন্ন লৌকিক ভাষা প্রচলিত ছিল। বৈদিক ছিল অভিজাততন্ত্রের ভাষা। লৌকিক ছিল গণতন্ত্রের ভাষা। ঋষিরা বলিলেন 'লৌকিক ভাষা অগ্রাহ্য, অকথ্য। ন ম্লেচ্ছিতবৈ। নাপভাষিতবৈ। ম্লেচ্ছ ভাষা ব্যবহার করিও না। অপভাষা ব্যবহার করিও না। যদি কর প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।" ঋষিরা বলিলেন, "খবরদার। ব্যঞ্জনের উচ্চারণে কিংবা স্বরের উচ্চারণে যদি এক চুল পরিমাণ এদিক ওদিক্ হয়, তবে আর

তোমার রক্ষা নাই। দেখ না অসুরেরা "হে অরয়ঃ হে অরয়ঃ' স্থানে 'হেলয়ঃ হেলয়ঃ' বলিয়াছিল' তাই তাহারা ধ্বংস হইয়া গেল। দেখ না বৃত্রের পিতা পুত্রেষ্টি যজ্ঞে ইন্দ্রশক্রু শব্দ বলিতে স্বরে অপরাধ করিয়াছিল। তাই বৃত্র ইন্দ্রের জেতা না হইয়া ইন্দ্রই বৃত্রের নিহন্তা হইল।" ঋষিদিগের শত সহস্র দোহাইতেও কিন্তু বৈদিক ভাষা পুজা অর্চনায় ছাড়া অন্যত্র লৌকিক ভাষার নিকট টিকিতে পারিল না। গণতন্ত্রের নিকট অভিজাততন্ত্রের পরাজয় হইল।

পরবর্তীকালে উচ্চ বর্ণেরা লৌকিক ভাষাকে মার্জিত করিয়া সংস্কৃত করিয়া লইল। সাধারণে লৌকিক ভাষা পালি ব্যবহার করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রকারেরা বলিলেন, "ন ম্লেচ্ছভাষাং শিক্ষেত – ম্লেচ্ছ ভাষা শিখিও না।" তখন ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের দুর্দশা, বৌদ্ধ ধর্ম্ম তাহার নবীন তেজে দণ্ডায়মান। কেহ ব্রাহ্মণের কথা শুনিল না। বৌদ্ধ গণতন্ত্রের পক্ষ লইল। পালি ভাষা এক বিপুল সাহিত্যের ভাষা হইল। গণতন্ত্রের নিকট অভিজাততন্ত্রের পরাজয় হইল।

আর এক যুগ আসিল। এখন রাজশক্তি বৌদ্ধ। বৌদ্ধ এখন অভিজাততন্ত্রের দিকে। বৌদ্ধ এখন ধর্ম্মের দোহাই দিয়া পালিকে ধরিয়া রাখিতে চাহিল; তখন কিন্তু গণতন্ত্রের পক্ষ হইল জৈন ধর্ম্ম। তখন লৌকিক ভাষা প্রাকৃত। পালি প্রাকৃতের নিকট তিষ্ঠিতে পারিল না। গণতন্ত্রের নিকট অভিজাততন্ত্রের পরাজয় হইল।

আর এক যুগ আসিল। এ-যুগ অন্ধকারময়। এ যুগে উচ্চ শ্রেণীর প্রাকৃত নিম্ন শ্রেণীর অপভ্রংশের নিকট পরাজিত হইল। এই অপভ্রংশ হইল বাংলা, উড়িয়া, আসামী, হিন্দী, গুজরাতী, মারহাঠী প্রভৃতি দেশীয় ভাষাসমূহের মূল।

তার পর আধুনিক যুগ। এ যুগে পণ্ডিতেরা সাধারণের ভাষাকে মাজিয়া ঘষিয়া সাধু ভাষা করিয়া লইলেন, বিশাল জন সাধারণের ভাষাকে ইতর ভাষা বলিয়া ফেলিয়া রাখিলেন। বর্তমানে এই ইতর ভাষা পণ্ডিতের ভাষার উপর আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে চাহিতেছে। পণ্ডিত তাঁহার অন্ধ সংস্কৃতভক্তির জন্য বাংলা ভাষাকে সংস্কৃতের দুর্বহ শিকলে বাঁধিতে চাহিতেছেন। আর ইতর ভাষা সেই শিকলকে কাটিতে চাহিতেছে। তাহার চেষ্টা ফলবতী হইবে কি? যদি ভারতের ভাষা-ইতিহাসের শিক্ষা মিথ্যা না হয়, তবে নিশ্চয়ই এক দিন এই ইতর ভাষা সাধু ভাষাকে, যেমন লৌকিক বৈদিককে, পালি সংস্কৃতকে, প্রাকৃত পালিকে, অপভ্রংশ প্রাকৃতকে ঠেলিয়া দিয়াছিল সেইরূপে ঠেলিয়া ফেলিবে। সাধুভাষা মৃত ভাষারূপে পুস্তকে ঠাঁই পাইবে। যেমন মিলটন, জনসন প্রভৃতির লাটিন বহুল ভাষা এখন কেবল কেতাবী ভাষা রহিয়াছে, এখনকার সাধু ভাষার অবস্থাও সেই রূপ হইবে। পরিণামে চরম পন্থারই জয় হইবে। তবে মধ্যম পন্থা বর্তমান পরিবর্তনশীল যুগের (Transitional period এর) উপযুক্ত ভাষা বটে। একেবারে নি হইতে সা-তে সুর নামাইতে গেলে অনেকের কানে বেখাপ্পা লাগিবে নিশ্চয়ই।

ভাষাবিজ্ঞান শিক্ষা দান করে যে বহু প্রাদেশিক বিভাষার মধ্যে যে বিভাষায় বহু সদগ্রন্থ রচিত হয় বা যাহা রাজশক্তির আশ্রয় পায়, তাহা সাহিত্যের ভাষা হইয়া উঠে। জীবজগতের ন্যায় বিভাষাগুলির মধ্যেও যোগ্যতমের পরিত্রাণ নীতি চলিয়া আসিতেছে। সাহিত্যিক

শক্তিতে নবদ্বীপের বুলি সমস্ত বাংলার সাহিত্যের ভাষা হইয়া উঠিয়াছিল। এখন পুনরায় সাহিত্যিক শক্তিতে ও রাজশক্তির আশ্রয়ে কলিকাতার বুলি বাংলা সাহিত্যের ভাষা হইয়া উঠিতেছে। এখন বাংলার বিভিন্ন জেলার ভদ্রলোক আপোসে কথাবার্তার জন্য কলিকাতার বুলিই ব্যবহার করেন। সাহিত্যিক ভাষা হইয়া উঠিবার ইহাই সূচনা। তারপর রবি বাবু প্রমুখ কলিকাতাবাসী সাহিত্যিকগণের প্রভাবে এই বিভাষা সাহিত্যের ভাষার স্থান অধিকার করিতে চলিয়াছে।

ভাষার-রীতি সম্বন্ধে আর একটী কথা বলিয়া এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য শেষ করিতেছি। একদল অন্ধ সংস্কৃতভক্ত বাংলা ভাষার মধ্যে প্রচলিত আরবী পারসী শব্দগুলিকে যাবনিক বলিয়া বর্জ্জন করিতে চাহেন। আমি বলি আগে তাঁহারা বাংলা দেশ হইতে যবনকে দূর করুন, পরে ভাষা হইতে যাবনিক শব্দগুলি দূর করিবেন। যখন সংস্কৃত ভাষা হোরা, কেন্দ্র, জামিত্র, দীনার প্রভৃতি গ্রীক শব্দ এবং ইকবাল, ইন্দুবার, মুকাবিলা প্রভৃতি আরবী শব্দ গ্রহণ করিয়াছে, তখন বাংলা ভাষার বেলায় আপত্তি কেন? ঐ সকল আরবী-পারসী শব্দ বাংলা ভাষার অস্থিমজ্জাগত হইয়াছে। ভাষা হইতে ইহাদিগকে তাড়ান সহজ ব্যাপার হইবে না। দোয়াত, কলম, কাগজ, জামা, কামিজ, কমর, বগল প্রভৃতি আইন আদালতে প্রচলিত সর্ব্ব-সাধারণের সহজবোধ্য হাজার খানিক শব্দ ত্যাগ করিয়া নূতন শব্দ গড়িলে তাহা নামের জোরে পুস্তকে চলিতে পারে বটে, কিন্তু তাহা ভাষায় চলিবে না। বাংলা ভাষায় আরবী, পারসী, তুরকী, ইংরাজী, ফরাসী, পর্তুগীজ প্রভৃতি যে কোনও ভাষার শব্দ বেমালুম খাপ খাইয়া গিয়াছে, তাহারা নিজেদের দখলী স্বত্ববলে বাংলা ভাষায় থাকিবে। তাহাদিগকে তাড়াইতে গেলে জুলুম করা হইবে।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর বিখ্যাত রচনা ‘তৈল’

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

মার্চ ১৯, ২০২৩



অ+ অ-

|| ভূমিকার বদলে ||

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী [৬ ডিসেম্বর ১৮৫৩–১৭ নভেম্বর ১৯৩১] একজন বিখ্যাত বাঙালি ভারততত্ত্ববিদ, সংস্কৃত বিশারদ, সংরক্ষণবিদ ও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচয়িতা। তার আসল নাম ছিল হরপ্রসাদ ভট্টাচার্য। তিনি বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাপদের আবিষ্কর্তা। তিনি সন্ধ্যাকর নন্দী রচিত রামচরিতম্ বা রামচরিতমানস পুঁথির সংগ্রাহক। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ব্রিটিশ বাংলা প্রদেশের [বর্তমান বাংলাদেশ] খুলনা জেলার কুমিরা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তবে আদি নিবাস ছিল উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার নৈহাটিতে। তার পারিবারিক পদবী ছিল ভট্টাচার্য। গ্রামের স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনের পর হরপ্রসাদ কলকাতার সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুল ও প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়াশোনা করেন। কলকাতায় তিনি তার বড়দা নন্দকুমার ন্যায়চঞ্চুর বন্ধু তথা বিশিষ্ট সমাজ সংস্কারক ও পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সঙ্গে থাকতেন। বিএ পরীক্ষায় সংস্কৃতে প্রথম হওয়ায় প্রতি মাসে ৫০ টাকা ‘সংস্কৃত কলেজ স্নাতক বৃত্তি’, ৫ টাকা ‘লাহা বৃত্তি’, এবং ‘রাধাকান্ত দেব মেডেল’ লাভ করেন। ১৮৭৭ সালে সংস্কৃতে সাম্মানিক হন। পরে এম.এ. পরীক্ষায় পাস করে তিনি ‘শাস্ত্রী’ উপাধি লাভ

করেন। ১৮৭৮ সালে তিনি হেয়ার স্কুলে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। ১৮৮৩ সালে তিনি সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেন। ১৯০৮ সালে সংস্কৃত কলেজ থেকে অবসর নিয়ে তিনি সরকারের তথ্যকেন্দ্রে যোগ দেন। ১৯২১ থেকে ১৯২৪ পর্যন্ত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপক এবং বিভাগীয় প্রধান।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর প্রথম গবেষণাপত্রটি ভারত মহিলা নামে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত বঙ্গদর্শন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সেই সময় তিনি ছিলেন ছাত্র। পরে হরপ্রসাদ এই পত্রিকার নিয়মিত লেখকে পরিণত হন। হরপ্রসাদকে ভারততত্ত্ব বিষয়ে আগ্রহী করে তোলেন বিশিষ্ট ভারততত্ত্ববিদ রাজেন্দ্রলাল মিত্র। তিনি রাজেন্দ্রলালের দ্য সংস্কৃত বুদ্ধিস্ট লিটারেচার অফ নেপাল গ্রন্থে সংকলিত বৌদ্ধ পুরাণগুলোর অনুবাদ শুরু করেন। এশিয়াটিক সোসাইটিতে তিনি রাজেন্দ্রলালের সহকারী ছিলেন। রাজেন্দ্রলালের মৃত্যুর পর সোসাইটিতে সংস্কৃত পুঁথি অন্বেষণ বিভাগের পরিচালক হন। অল্প কয়েকজন সহকারী নিয়ে হরপ্রসাদ এশিয়াটিক সোসাইটির দশ হাজার পুঁথির ক্যাটালগ প্রস্তুত করেন। এই ক্যাটালগের যে দীর্ঘ মুখবন্ধটি তিনি রচনা করেছিলেন, তা সংস্কৃত সাহিত্যের একটি মূল্যবান ইতিহাস। সংস্কৃত পুঁথি নিয়ে চর্চা করতে করতেই হরপ্রসাদ বাংলা পুঁথির বিষয়েও আগ্রহী হয়ে ওঠেন। পুঁথির সন্ধানে তিনি অনেকবার নেপাল গিয়েছিলেন। বাংলা ভাষার প্রথম গ্রন্থ ১৯০৭ সালে নেপালের রাজদরবার থেকে তিনি আবিষ্কার করেন ‘চর্য্য বিনিশ্চয়’, চর্যাগীতি বা চর্যাপদের পুঁথি। এই পুঁথিগুলো নিয়ে গবেষণার মাধ্যমে তিনি প্রমাণ করেন এগুলোই বাংলা সাহিত্যের আদিতম নিদর্শন।

১৮৯৬ সালে ‘মহামহোপাধ্যায়’ উপাধি লাভ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি-লিট উপাধিতে ভূষিত হন ১৯২৭ সালে। ১৯১৬ সালে চর্যাপদের পুঁথি নিয়ে রচিত তার গবেষণাপত্র হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় রচিত বৌদ্ধ গান ও দোঁহা নামে প্রকাশিত হয়। হরপ্রসাদ অনেক প্রাচীন গ্রন্থ সংগ্রহ করে প্রকাশ করেছিলেন। তিনি বহু গবেষণাপত্রও রচনা করেন। তিনি ছিলেন এক খ্যাতনামা হিস্টোরিওগ্রাফার। কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ লাভ করেছিলেন বহু পুরস্কার ও সম্মান। তার বিখ্যাত বই বাল্মীকির জয়, মেঘদূত ব্যাখ্যা, বেণের মেয়ে [উপন্যাস], কাঞ্চনমালা [উপন্যাস], সচিত্র রামায়ণ, প্রাচীন বাংলার গৌরব ও বৌদ্ধধর্ম। ইংরেজি গ্রন্থ *Vernacular Literature of Bengal Before the Introduction of English Education*, *Discovery of Living Buddhism in Bengal*, *Magadhan Literature*, *Sanskrit Culture in Modern India*. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তৈল রচনাটি লিখেছিলেন ‘বঙ্গদর্শন’ পত্রিকায়। এটি প্রকাশিত হয়েছিল ১২৮৫ বাংলায়। তাঁর সবচেয়ে আলোচিত এই ব্যঙ্গাত্মক, বুদ্ধিদীপ্ত ও সমাজবাস্তবতা নির্ভর রচনাটি প্রকাশের এত বছর পর আবেদন ফুরায়নি। বরং এটি সমসাময়িক ও প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। বর্তমান সমাজ-সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটের কথা বিবেচনা করে রচনাটি প্রতিধ্বনির পাঠকের জন্য তুলে দেওয়া হলো।

কে যে তৈল দিবার পাত্র নয়, তাহা বলা যায় না। পুঁটে তেলি হইতে লাটসাহেব পর্যন্ত তৈল দিবার পাত্র। তৈল এমন জিনিষ নয় যে, নষ্ট হয়। একবার দিয়া রাখিলে নিশ্চয়ই কোন না কোন ফল ফলিবে। কিন্তু তথাপি যাহার নিকট উপস্থিত কাজ আদায় করিতে হইবে, সেই তৈলনিষেধের প্রধান পাত্র।

তৈল || হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

তৈল যে কি পদার্থ, তাহা সংস্কৃত কবিরা কতক বুঝিয়াছিলেন। তাঁহাদের মতে, তৈলের অপর নাম স্নেহ। বাস্তবিকও স্নেহ ও তৈল একই পদার্থ। আমি তোমায় স্নেহ করি, তুমি আমায় স্নেহ কর অর্থাৎ আমরা পরস্পরকে তৈল দিয়া থাকি। স্নেহ কি? যাহা স্নিগ্ধ বা ঠাণ্ডা করে, তাহার নাম স্নেহ। তৈলের ন্যায় ঠাণ্ডা করিতে আর কিসে পারে?

সংস্কৃত কবিরা ঠিকই বুঝিয়াছিলেন। যেহেতু তাহারা সকল মনুষ্যকেই সমান রূপে স্নেহ করিতে বা তৈল প্রদান করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

বাস্তবিকই তৈল সর্বশক্তিমান; যাহা বলের অসাধ্য, যাহা বিদ্যার অসাধ্য, যাহা ধনের অসাধ্য, যাহা কৌশলের অসাধ্য, তাহা কেবল একমাত্র তৈল দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে।

যে সর্বশক্তিময় তৈল ব্যবহার করিতে জানে, সে সর্বশক্তিমান। তাহার কাছে জগতের সকল কাজই সোজা। তাহার চাকরির জন্য ভাবিতে হয় না—উকিলিতে পসার করিবার জন্য সময় নষ্ট করিতে হয় না, বিনা কাজে বসিয়া থাকিতে হয় না, কোন কাজেই শিক্ষানবিশ থাকিতে হয় না। যে তৈল দিতে পারিবে, তাহার বিদ্যা না থাকিলেও সে প্রফেসার হইতে পারে। আহাম্মুক হইলেও ম্যাজিষ্ট্রেট হইতে পারে, সাহস না থাকিলেও সেনাপতি হইতে পারে এবং দুর্লভ রাম হইয়াও উড়িষ্যার গভর্ণর হইতে পারে।

তৈলের মহিমা অতি অপরূপ। তৈল নহিলে জগতের কোন কাজ সিদ্ধ হয় না। তৈল নহিলে কল চলে না, প্রদীপ জ্বলে না, ব্যঞ্জন সুস্বাদু হয় না, চেহেরা খোলে না, হাজার গুণ থাকুক তাহার পরিচয় পাওয়া যায় না, তৈল থাকিলে তাহার কিছুরই অভাব থাকে না।

সর্বশক্তিময় তৈল নানারূপে সমস্ত পৃথিবী ব্যাপ্ত করিয়া আছেন। তৈলের যে মূর্তিতে আমরা গুরুজনকে স্নিগ্ধ করি, তাহার নাম ভক্তি, যাহাতে গৃহিণীকে স্নিগ্ধ করি, তাহার নাম প্রণয়; যাহাতে প্রতিবেশীকে স্নিগ্ধ করি, তাহার নাম মৈত্রী; যাহা দ্বারা সমস্ত জগৎকে স্নিগ্ধ করি, তাহার নাম শিষ্টাচার ও সৌজন্য 'ফিলনথপি।' যাহা দ্বারা সাহেবকে স্নিগ্ধ করি তাহার নাম লয়েলটি; যাহা দ্বারা বড়লোককে স্নিগ্ধ করি, তাহার নাম নম্রতা বা মডেষ্টি। চাকর-বাকর প্রভৃতিকেও আমরা তৈল দিয়া থাকি, তাহার পরিবর্তে ভক্তি বা যত্ন পাই। অনেকের নিকট তৈল দিয়া তৈল বাহির করি।

পরস্পর ঘর্ষিত হইলে সকল সকল বস্তুতেই অগ্ন্যুদ্গম হয়। অগ্ন্যুদ্গম নিবারণের একমাত্র উপায় তৈল। এইজন্যই রেলের চাকায় তৈলের অনুকল্প চর্বি দিয়া থাকে। এইজন্যই যখন দুজনে ঘোরতর বিবাদে লঙ্কাকাণ্ড উপস্থিত হয়, তখন রফা নামক তৈল আসিয়া উভয় ঠাণ্ডা করিয়া দেয়। তৈলের যদি অগ্নিনিবারণী শক্তি না থাকিত, তবে গৃহে গৃহে গ্রামে গ্রামে পিতা-পুত্রে স্বামী-স্ত্রীতে রাজায়-প্রজায় বিবাগ-বিসম্বাদে নিরন্তর অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইত।

পূর্বেই বলা গিয়াছে, যে তৈল দিতে পারে, সে সর্বশক্তিমান, কিন্তু তৈল দিলেই হয় না। দিবার পাত্র আছে, সময় আছে, কৌশল আছে।

তৈল দ্বারা অগ্নি পর্যন্ত বশতাপন্ন হয়। অগ্নিতে অল্প তৈল দিয়া সমস্ত রাত্রি ঘরে আবদ্ধ রাখা যায়। কিন্তু সে তৈল মূর্তিমান্।

কে যে তৈল দিবার পাত্র নয়, তাহা বলা যায় না। পুঁটে তেলি হইতে লাটসাহেব পর্যন্ত তৈল দিবার পাত্র। তৈল এমন জিনিষ নয় যে, নষ্ট হয়। একবার দিয়া রাখিলে নিশ্চয়ই কোন না কোন ফল ফলিবে। কিন্তু তথাপি যাহার নিকট উপস্থিত কাজ আদায় করিতে হইবে, সেই তৈলনিষেধের প্রধান পাত্র।

সময়—যে সময়েই হউক, তৈল দিয়া রাখিলেই কাজ হইবে। কিন্তু উপযুক্ত সময়ে অল্প তৈলে অধিক কাজ হয় ।

কৌশল—পূর্বেই উল্লেখ করা গিয়েছে, যেরূপেই হউক, তৈল দিলে কিছু না কিছু উপকার হইবে। যেহেতু তৈল নষ্ট হয় না, তথাপি দিবার কৌশল আছে। তাহার প্রমাণ ভট্টাচার্যেরা সমস্ত দিন বকিয়াও যাহার নিকট পাঁচ সিকা বৈ আদায় করিতে পারিল না, একজন ইংরেজিওয়ালা তাহার নিকট অনায়াসে ৫০ টাকা বাহির করিয়া লইয়া গেল। কৌশল করিয়া এক বিন্দু দিলে যত কাজ হয়, বিনা কৌশলে কলস কলস ঢালিলেও তত হয় না।

ব্যক্তিবিশেষে তৈলের গুণতারতাম্য অনেক আছে। নিষ্কৃত্রিম তৈল পাওয়া অতি দুর্লভ। কিন্তু তৈলের এমনি একটি আশ্চর্য সম্মিলনীশক্তি আছে যে, তাহাতে যে উহা অন্য সকল পদার্থের গুণই আত্নসাৎ করিতে পারে। যাহার বিদ্যা আছে, তাহার তৈল আমার তৈল হইতে মূল্যবান। বিদ্যার উপর যাহার

বুদ্ধি আছে, তাহার আরও মূল্যবান। তাহার উপর যদি ধন থাকে, তবে তাহার প্রতি বিন্দুর মূল্য লক্ষ টাকা। কিন্তু তৈল না থাকিলে তাহার বুদ্ধি থাকুক, হাজার বিদ্যা থাকুক, হাজার ধন থাকুক, কেহই টের পায় না।

তৈল দিবার প্রবৃত্তি স্বাভাবিক। এ প্রবৃত্তি সকলেরই আছে এবং সুবিধামত আপন গৃহে ও আপন দলে সকলেই ইহা প্রয়োগ করিয়া থাকে, কিন্তু অনেকে এত অধিক স্বার্থপর, বাহিরের লোককে তৈল দিতে পারে না। তৈলদান প্রবৃত্তি স্বাভাবিক হইলেও উহাতে কৃতকার্য হওয়া অদৃষ্টসাপেক্ষ।

আজকাল বিজ্ঞান, শিল্প প্রভৃতি শিখাইবার জন্য নানাবিধ চেষ্টা চলিতেছে। যাহাতে বঙ্গের লোক প্রাকটিক্যাল অর্থাৎ কাজের লোকের হইতে পারে; তজ্জন্য সকলেই সচেষ্ট, কিন্তু কাজের লোক হইতে হইলে তৈলদান সকলের আগে দরকার। অতএব তৈলদানের একটি স্কুলের নিতান্ত প্রয়োজন। অতএব আমরা প্রস্তাব করি, বাছিয়া বাছিয়া কোন রায়বাহাদুর অথবা খাঁ বাহাদুরকে প্রিন্সিপাল করিয়া শীঘ্র একটি স্নেহ-নিষেধের কালেজ খোলা হয়। অন্ততঃ উকিলি শিক্ষার নিমিত্ত ল—কালেজে একজন তৈল অধ্যাপক নিযুক্ত করা আবশ্যক। কালেজ খুলিতে পারিলে ভালই হয়।

কিন্তু এরূপ কালেজ খুলিতে হইলে প্রথমতই গোলযোগ উপস্থিত হয়। তৈল সবাই দিয়া থাকেন—কিন্তু কেহই স্বীকার করেন না যে, আমি দেই। সুতরাং এ বিদ্যার অধ্যাপক জোটা ভার। এ বিদ্যা শিখিতে হইলে দেখিয়া শুনিয়া শিখিতে হয়। রীতিমত লেকচার পাওয়া যায় না। যদিও কোন রীতিমত কালেজ নাই, তথাপি যাঁহার নিকট চাকরীর বা প্রমোশনের সুপারিস মিলে, তাদৃশ লোকের বাড়ী সদাসর্বদা গেলে উত্তমরূপ শিক্ষালাভ করা যাইতে পারে। বাঙালীর বল নাই, বিক্রম নাই, বিদ্যাও নাই, বুদ্ধিও নাই। সুতরাং বাঙালীর একমাত্র ভরসা তৈল—বাঙালীর যে কেহ কিছু করিয়াছেন, সকলই তৈলের জোরে, বাঙালীদিগের তৈলের মূল্য অধিক নয়; এবং কি কৌশলে সেই তৈল বিধাতৃপুরুষদিগের সুখসেব্য হয়, তাহাও অতি অল্পলোক জানেন। যাঁহারা জানেন, তাঁহাদিগকে আমরা ধন্যবাদ দিই। তাঁহারাই আমাদের দেশের বড় লোক, তাঁহারাই আমাদের দেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়া আছেন।

তৈল বিধাতৃপুরুষদিগের সুখসেব্য হইবে, ইচ্ছা করিলে সে শিক্ষা এদেশে হওয়া হওয়া কঠিন। তজ্জন্য বিলাত যাওয়া আবশ্যক। তত্রত্য রমণীরা এ বিষয়ের প্রধান অধ্যাপক, তাহাদের থ্রু হইলে তৈল শীঘ্র কাজে আইসে।

শেষে মনে রাখা উচিত, এক তৈলে চাকাও ঘোরে আর তৈলে মনও ফেরে।

সমাপ্তি

প্রথম পরিচ্ছেদ

অপূর্বকৃষ্ণ বি. এ. পাস করিয়া কলিকাতা হইতে দেশে ফিরিয়া আসিতেছেন।

নদীটি ক্ষুদ্র। বর্ষা অন্তে প্রায় শুকাইয়া যায়। এখন শ্রাবণের শেষে জলে ভরিয়া উঠিয়া একেবারে গ্রামের বেড়া ও বাঁশঝাড়ের তলদেশ চুম্বন করিয়া চলিয়াছে।

বহুদিন ঘন বর্ষার পরে আজ মেঘমুক্ত আকাশে রৌদ্র দেখা দিয়াছে।

নৌকায় আসীন অপূর্বকৃষ্ণের মনের ভিতরকার একখানি ছবি যদি দেখিতে পাইতাম তবে দেখিতাম সেখানেও এই যুবকের মানস-নদী নববর্ষায় কূলে কূলে ভরিয়া আলোকে জ্বলজ্বল এবং বাতাসে ছলছল করিয়া উঠিতেছে।

নৌকা যথাস্থানে ঘাটে আসিয়া লাগিল। নদীতীর হইতে অপূর্বদের বাড়ির পাকা ছাদ গাছের অন্তরাল দিয়া দেখা যাইতেছে। অপূর্বের আগমন-সংবাদ বাড়ির কেহ জানিত না সেইজন্য ঘাটে লোক আসে নাই। মাঝি ব্যাগ লইতে উদ্যত হইলে অপূর্ব তাহাকে নিবারণ করিয়া নিজেই ব্যাগ হাতে লইয়া আনন্দভরে তাড়াতাড়ি নামিয়া পড়িল।

নামিবামাত্র, তীরে ছিল পিছল, ব্যাগসমেত অপূর্ব কাদায় পড়িয়া গেল। যেমন পড়া, অমনি,--কোথা হইতে এক সুমিষ্ট উচ্চকণ্ঠে তরল হাস্যলহরী উচ্ছ্বসিত হইয়া নিকটবর্তী অশথগাছের পাখিগুলিকে সচকিত করিয়া দিল।

অপূর্ব অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া তাড়াতাড়ি আত্মসংবরণ করিয়া চাহিয়া দেখিল। দেখিল, তীরে মহাজনের নৌকা হইতে নূতন ইঁট রাশীকৃত করিয়া নামাইয়া রাখা হইয়াছে, তাহারই উপরে বসিয়া একটি মেয়ে হাস্যবেগে এখনই শতধা হইয়া যাইবে এমনি মনে হইতেছে।

অপূর্ব চিনিতে পারিল তাহাদেরই নূতন প্রতিবেশিনীর মেয়ে মৃন্ময়ী। দূরে বড়ো নদীর ধারে ইহাদের বাড়ি ছিল, সেখানে নদীর ভাঙনে দেশ ত্যাগ করিয়া বছর দুই-তিন হইল এই গ্রামে আসিয়া বাস করিতেছে।

এই মেয়েটির অখ্যাতির কথা অনেক শুনিতে পাওয়া যায়। পুরুষ গ্রামবাসীরা স্নেহভরে ইহাকে পাগলী বলে, কিন্তু গ্রামের গৃহিণীরা ইহার উচ্ছৃঙ্খল স্বভাবে সর্বদা ভীত চিন্তিত শঙ্কান্বিত। গ্রামের যত ছেলেদের সহিতই ইহার খেলা; সমবয়সী মেয়েদের প্রতি অবজ্ঞার সীমা নাই। শিশুরাজ্যে এই মেয়েটি একটি ছোটোখাটো বর্গির উপদ্রব বলিলেই হয়।

বাপের আদরের মেয়ে কিনা, সেইজন্য ইহার এতটা দুর্দান্ত প্রতাপ। এই সম্বন্ধে বন্ধুদের নিকট মৃন্ময়ীর মা স্বামীর বিরুদ্ধে সর্বদা অভিযোগ করিতে ছাড়িত না, অথচ বাপ ইহাকে ভালোবাসে, বাপ কাছে থাকিলে মৃন্ময়ীর চোখের অশ্রুবিন্দু তাহার অন্তরে বড়োই বাজিত ইহাই মনে করিয়া প্রবাসী স্বামীকে স্মরণপূর্বক মৃন্ময়ীর মা মেয়েকে কিছুতেই কাঁদাইতে পারিত না।

মৃন্ময়ী দেখিতে শ্যামবর্ণ। ছোটো কোঁকড়া চুল পিঠ পর্যন্ত পড়িয়াছে। ঠিক যেন বালকের মতো মুখের ভাব। মস্ত মস্ত দুটি কালো চক্ষুতে না আছে লজ্জা, না আছে ভয়, না আছে হাবভাবলীলার লেশমাত্র। শরীর দীর্ঘ পরিপুষ্ট সুস্থ সবল, কিন্তু তাহার বয়স অধিক কি অল্প সে প্রশ্ন কাহারও মনে উদয় হয় না; যদি হইত, তবে এখনও অবিবাহিত আছে বলিয়া লোকে তাহার পিতামাতাকে নিন্দা করিত। গ্রামে বিদেশী জমিদারের নৌকা কালক্রমে যেদিন ঘাটে আসিয়া লাগে সেদিন গ্রামের লোকেরা সম্ভ্রমে শশব্যস্ত হইয়া উঠে, ঘাটের মেয়েদের মুখ-রঙ্গভূমিতে অকস্মাৎ নাসাগ্রভাগ পর্যন্ত যবনিকাপতন হয়, কিন্তু মৃন্ময়ী কোথা হইতে একটা উলঙ্গ শিশুকে কোলে লইয়া কোঁকড়া চুলগুলি পিঠে দোলাইয়া ছুটিয়া ঘাটে আসিয়া উপস্থিত। যে দেশে ব্যাধ নাই বিপদ নাই সেই দেশের হরিণশিশুর মতো নির্ভীক

কৌতূহলে দাঁড়াইয়া চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে থাকে, অবশেষে আপন দলের বালকসঙ্গীদের নিকট ফিরিয়া গিয়া এই নবাগত প্রাণীর আচারব্যবহার সম্বন্ধে বিস্তর বাহুল্য বর্ণনা করে।

আমাদের অপূর্ব ইতিপূর্বে ছুটি উপলক্ষে বাড়ি আসিয়া এই বন্ধনবিহীন বালিকাটিকে দুই-চারিবার দেখিয়াছে এবং অবকাশের সময়, এমন কি, অনবকাশের সময়ও ইহার সম্বন্ধে চিন্তা করিয়াছে। পৃথিবীতে অনেক মুখ চোখে পড়ে কিন্তু এক একটি মুখ বলাকহা নাই একেবারে মনের মধ্যে গিয়া উত্তীর্ণ হয়। সে কেবল সৌন্দর্যের জন্য নহে, আর একটা কী গুণ আছে। সে গুণটি বোধ করি স্বচ্ছতা। অধিকাংশ মুখের মধ্যেই মনুষ্যপ্রকৃতিটি আপনাকে পরিস্ফুটরূপে প্রকাশ করিতে পারে না; যে-মুখে সেই অন্তর-গুহাবাসী রহস্যময় লোকটি অবাধে বাহির হইয়া দেখা দেয়, সে মুখ সহস্রের মধ্যে চোখে পড়ে এবং এক পলকে মনে মুদ্রিত হইয়া যায়। এই বালিকার মুখে চোখে একটি দুরন্ত অবাধ্য নারীপ্রকৃতি উন্মুক্ত বেগবান অরণ্যমৃগের মতো সর্বদা দেখা দেয়, খেলা করে, সেইজন্য এই জীবনচঞ্চল মুখখানি একবার দেখিলে আর সহজে ভোলা যায় না।

পাঠকদিগকে বলা বাহুল্য, মৃন্ময়ীর কৌতুকহাস্যধ্বনি যতই সুমিষ্ট হউক দুর্ভাগা অপূর্বর পক্ষে কিঞ্চিৎ ক্লেশদায়ক হইয়াছিল। সে তাড়াতাড়ি মাঝির হাতে ব্যাগ সমর্পণ করিয়া রক্তিমমুখে দ্রুতবেগে গৃহ অভিমুখে চলিতে লাগিল।

আয়োজনটি অতি সুন্দর হইয়াছিল। নদীর তীর, গাছের ছায়া, পাখির গান, প্রভাতের রৌদ্র, কুড়ি বৎসর বয়স; অবশ্য ইঁটের স্তূপটা তেমন উল্লেখযোগ্য নহে, কিন্তু যে ব্যক্তি তাহার উপর বসিয়া ছিল সে এই শুষ্ক কঠিন আসনের প্রতিও একটি মনোরম শ্রী বিস্তার করিয়াছিল। হায়, এমন দৃশ্যের মধ্যে প্রথম পদক্ষেপমাত্রেই যে সমস্ত কবিত্ব প্রহসনে পরিণত হয় ইহা অপেক্ষা অদৃষ্টের নিষ্ঠুরতা আর কী হইতে পারে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সেই ইষ্টকশিখর হইতে প্রবহমান হাস্যধ্বনি শুনিতে শুনিতে চাদরে ও ব্যাগে কাদা মাখিয়া গাছের ছায়া দিয়া অপূর্ব বাড়িতে গিয়া উপস্থিত হইল।

অকস্মাৎ পুত্রের আগমনে তাহার বিধবা মাতা পুলকিত হইয়া উঠিলেন। তৎক্ষণাৎ ক্ষীর-দধি-রুইমাছের সন্ধানে দূরে নিকটে লোক দৌড়িল এবং পাড়াপ্রতিবেশীর মধ্যেও একটা আন্দোলন উপস্থিত হইল।

আহারান্তে মা অপূর্বর বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। অপূর্ব সেজন্য প্রস্তুত হইয়া ছিল। কারণ প্রস্তাব অনেক পূর্বেই ছিল, কিন্তু পুত্র নব্যতন্ত্রের নূতন ধুয়া ধরিয়া জেদ করিয়া বসিয়া ছিল যে, বি এ পাস না করিয়া বিবাহ করিব না। এতকাল জননী সেইজন্য অপেক্ষা করিয়া ছিলেন, অতএব এখন আর কোনো ওজর করা মিথ্যা। অপূর্ব কহিল, 'আগে পাত্রী দেখা হউক, তাহার পর স্থির হইবে।' মা কহিলেন, 'পাত্রী দেখা হইয়াছে, সেজন্য তোকে ভাবিতে হইবে না।' অপূর্ব ওই ভাবনাটা নিজে ভাবিতে প্রস্তুত হইল এবং কহিল, 'মেয়ে না দেখিয়া বিবাহ করিতে পারিব না।' মা ভাবিলেন, এমন সৃষ্টিছাড়া কথাও কখনো শোনা যায় নাই, কিন্তু সম্মত হইলেন।

সে-রাত্রে অপূর্ব প্রদীপ নিবাইয়া বিছানায় শয়ন করিলে পর বর্ষানিশীথের সমস্ত শব্দ এবং সমস্ত নিস্তব্ধতার পরপ্রান্ত হইতে বিজন বিনিদ্র শয্যায় একটি উচ্ছ্বসিত উচ্চ মধুর কণ্ঠের হাস্যধ্বনি তাহার কানে আসিয়া ক্রমাগত বাজিতে লাগিল। মন নিজেকে কেবলই এই বলিয়া পীড়া দিতে লাগিল যে, সকালবেলাকার সেই পদস্খলনটা যেন কোনো একটা উপায়ে সংশোধন করিয়া লওয়া উচিত। বালিকা জানিল না যে, আমি অপূর্বকৃষ্ণ অনেক বিদ্যা উপার্জন করিয়াছি, কলিকাতায় বহুকাল যাপন করিয়া আসিয়াছি, দৈবাৎ পিছলে পা দিয়া কাদায় পড়িয়া গেলেও আমি উপহাস্য উপেক্ষণীয় একজন যে-সে গ্রাম্য যুবক নহি।

পরদিন অপূর্ব কনে দেখিতে যাইবে। অধিক দূরে নহে, পাড়াতেই তাহাদের বাড়ি। একটু বিশেষ যত্নপূর্বক সাজ করিল। ধুতি ও চাদর ছাড়িয়া সিল্কের চাপকান জোব্বা, মাথায় একটা গোলাকার পাগড়ি, এবং বার্নিশকরা একজোড়া জুতা পায়ে দিয়া সিল্কের ছাতা হস্তে প্রাতঃকালে বাহির হইল।

সম্ভাবিত শ্বশুরবাড়িতে পদার্পণ করিবামাত্র মহা সমারোহ-সমাদরের ঘটা পড়িয়া গেল। অবশেষে যথাকালে কম্পিতহৃদয় মেয়েটিকে ঝাড়িয়া মুছিয়া রং করিয়া খোঁপায় রাংতা জড়াইয়া একখানি পাতলা রঙিন কাপড়ে মুড়িয়া বরের সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করা হইল। সে এক কোণে নীরবে মাথা প্রায় হাঁটুর কাছে ঠেকাইয়া বসিয়া রহিল এবং এক প্রৌঢ়া দাসী তাহাকে সাহস দিবার জন্য পশ্চাতে উপস্থিত রহিল। কনের এক বালক ভাই তাহাদের পরিবারের মধ্যে এই এক নূতন অনধিকার প্রবেশোদ্যত লোকটির পাগড়ি, ঘড়ির চেন এবং নবোদগত শ্মশ্রু একমনে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। অপূর্ব কিয়ৎকাল গোঁফে তা দিয়া অবশেষে গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি কী পড়।' বসনভূষণাচ্ছন্ন লজ্জাস্তূপের নিকট হইতে তাহার কোনো উত্তর পাওয়া গেল না। দুই-তিনবার প্রশ্ন এবং প্রৌঢ়া দাসীর নিকট হইতে পৃষ্ঠদেশে বিস্তর উৎসাহজনক করতাড়নের পর বালিকা মৃদুস্বরে একনিঃশ্বাসে অত্যন্ত দ্রুত বলিয়া গেল, চারুপাঠ দ্বিতীয় ভাগ, ব্যাকরণসার প্রথম ভাগ, ভূগোলবিবরণ, পাটিগণিত, ভারতবর্ষের ইতিহাস। এমন সময় বহির্দেশে একটা অশান্ত গতির ধুপধাপ শব্দ শোনা গেল এবং মুহূর্তের মধ্যে দৌড়িয়া হাঁপাইয়া পিঠের চুল দোলাইয়া মৃন্ময়ী ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল। অপূর্বকৃষ্ণের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া একেবারে কনের ভাই রাখালের হাত ধরিয়া

টানাটানি আরম্ভ করিয়া দিল। রাখাল তখন আপন পর্যবেক্ষণশক্তির চর্চায় একান্তমনে নিযুক্ত ছিল, সে কিছুতেই উঠিতে চাহিল না। দাসীটি তাহার সংযত কণ্ঠস্বরের মৃদুতা রক্ষার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যথাসাধ্য তীব্রভাবে মৃন্ময়ীকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিল। অপূর্বকৃষ্ণ আপনার সমস্ত গাম্ভীর্য এবং গৌরব একত্র করিয়া পাগড়িপরা মস্তকে অভ্রভেদী হইয়া বসিয়া রহিল এবং পেটের কাছে ঘড়ির চেন নাড়িতে লাগিল। অবশেষে সঙ্গীটিকে কিছুতেই বিচলিত করিতে না পারিয়া তাহার পিঠে একটা সশব্দ চপেটাঘাত করিয়া এবং চট করিয়া কনের মাথার ঘোমটা টানিয়া খুলিয়া দিয়া ঝড়ের মতো মৃন্ময়ী ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। দাসীটি গুমরিয়া গর্জন করিতে লাগিল এবং ভগ্নীর অকস্মাৎ অবগুণ্ঠন মোচনে রাখাল খিল খিল শব্দে হাসিতে আরম্ভ-করিল। নিজের পৃষ্ঠের প্রবল চপেটাঘাতটি সে অন্যায় প্রাপ্য মনে করিল না, কারণ, এরূপ দেনা পাওনা তাহাদের মধ্যে সর্বদাই চলিতেছে। এমন কি, পূর্বে মৃন্ময়ীর চুল কাঁধ ছাড়াইয়া পিঠের মাঝামাঝি আসিয়া পড়িত; রাখালই একদিন হঠাৎ পশ্চাৎ হইতে আসিয়া তাহার ঝুঁটির মধ্যে কাঁচি চালাইয়া দেয়। মৃন্ময়ী তখন অত্যন্ত রাগ করিয়া তাহার হাত হইতে কাঁচিটি কাড়িয়া লইয়া নিজের অবশিষ্ট পশ্চাতের চুল ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দে নির্দয়ভাবে কাটিয়া ফেলিল, তাহার কোঁকড়া চুলের স্তবকগুলি শাখাচ্যুত কালো আঙুরের স্তূপের মতো গুচ্ছ গুচ্ছ মাটিতে পড়িয়া গেল। উভয়ের মধ্যে এরূপ শাসনপ্রণালী প্রচলিত ছিল।

অতঃপর এই নীরব পরীক্ষাসভা আর অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না। পিণ্ডাকার কন্যাটি কোনোমতে পুনশ্চ দীর্ঘাকার হইয়া দাসী সহকারে অন্তঃপুরে চলিয়া গেল। অপূর্ব পরম গম্ভীরভাবে বিরল গুম্ফরেখায় তা দিতে দিতে উঠিয়া ঘরের বাহিরে যাইতে উদ্যত হইল। দ্বারের নিকটে গিয়া দেখে, বার্নিশ-করা নূতন জুতাজোড়াটি যেখানে ছিল সেখানে নাই, এবং কোথায় আছে তাহাও বহুচেষ্টায় অবধারণ করা গেল না।

বাড়ির লোক সকলেই বিষম বিব্রত হইয়া উঠিল এবং অপরাধীর উদ্দেশে গালি ও ভর্ৎসনা অজস্র বর্ষিত হইতে লাগিল। অনেক খোঁজ করিয়া অবশেষে অনন্যোপায় হইয়া বাড়ির কর্তার পুরাতন ছিন্ন ঢিলা চটিজোড়াটা পরিয়া প্যান্টালুন চাপকান পাগড়ি সমেত সুসজ্জিত অপূর্ব কর্দমাক্ত গ্রামপথে অত্যন্ত সাবধানে চলিতে লাগিল।

পুষ্করিণীর ধারে নির্জন পথপ্রান্তে আবার হঠাৎ সেই উচ্চকণ্ঠের অজস্র হাস্য-কলোচ্ছ্বাস। যেন তরুপল্লবের মধ্য হইতে কৌতুকপ্রিয়া বনদেবী অপূর্বর ওই অসংগত চটিজুতাজোড়ার দিকে চাহিয়া হঠাৎ আর হাসি ধারণ করিয়া রাখিতে পারিল না।

অপূর্ব অপ্রতিহতভাবে থমকিয়া দাঁড়াইয়া ইতস্তত নিরীক্ষণ করিতেছে এমন সময় ঘন বন হইতে বাহির হইয়া একটি নির্লজ্জ অপরাধিনী তাহার সম্মুখে নূতন জুতাজোড়াটি রাখিয়াই পলায়নোদ্যত হইল। অপূর্ব দ্রুতবেগে দুই হাত ধরিয়া তাহাকে বন্দী করিয়া ফেলিল।

মৃন্ময়ী আঁকিয়া বাঁকিয়া হাত ছাড়াইয়া পলাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। কোঁকড়া চুলে বেষ্টিত তাহার পরিপুষ্ট সহাস্য দুষ্ট মুখখানির উপরে শাখান্তরালচ্যুত সূর্যকিরণ আসিয়া পড়িল। রৌদ্রোজ্জ্বল নির্মল চঞ্চল নির্ঝরিণীর দিকে অবনত হইয়া কৌতূহলী পথিক যেমন নিবিষ্টদৃষ্টিতে তাহার তলদেশ দেখিতে থাকে, অপূর্ব তেমনি করিয়া গম্ভীর গম্ভীর নেত্রে মৃন্ময়ীর উর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত মুখের উপর, তড়িত্তরল দুটি চক্ষুর মধ্যে চাহিয়া দেখিল এবং অত্যন্ত ধীরে ধীরে মুষ্টি শিথিল করিয়া যেন যথাকর্তব্য অসম্পন্ন রাখিয়া বন্দিনীকে ছাড়িয়া দিল। অপূর্ব যদি রাগ করিয়া মৃন্ময়ীকে ধরিয়া মারিত তাহা হইলে সে কিছুই আশ্চর্য হইত না, কিন্তু নির্জন পথের মধ্যে এই অপরূপ নীরব শাস্তির সে কোনো অর্থ বুঝিতে পারিল না।

নৃত্যময়ী প্রকৃতির নূপুরনিক্কণের ন্যায় চঞ্চল হাস্যধ্বনিটি সমস্ত আকাশ ব্যাপিয়া বাজিতে লাগিল এবং চিন্তানিমগ্ন অপূর্বকৃষ্ণ অত্যন্ত ধীরপদক্ষেপে বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অপূর্ব সমস্ত দিন নানা ছুতা করিয়া অন্তঃপুরে মার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেল না। বাহিরে নিমন্ত্রণ ছিল, খাইয়া আসিল। অপূর্বর মতো এমন একজন কৃতবিদ্য গম্ভীর ভাবুক লোক একটি সামান্য অশিক্ষিতা বালিকার কাছে আপনার লুপ্ত গৌরব উদ্ধার করিবার, আপনার আন্তরিক মাহাত্ম্যের পরিপূর্ণ পরিচয় দিবার জন্য কেন যে এতটা বেশি উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিবে তাহা বুঝা কঠিন। একটি পাড়াগাঁয়ের চঞ্চল মেয়ে তাহাকে সামান্য লোক মনে করিলই বা। সে যদি মুহূর্তকালের জন্য তাঁহাকে হাস্যাস্পদ করিয়া তার পর তাঁহার অস্তিত্ব বিস্মৃত হইয়া রাখাল-নামক একটি নির্বোধ নিরক্ষর বালকের সহিত খেলা করিবার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করে, তাহাতেই বা তাঁহার ক্ষতি কী। তাহার কাছে প্রমাণ করিবার আবশ্যক কী যে, তিনি বিশ্বদীপ-নামক মাসিক পত্রে গ্রন্থসমালোচনা করিয়া থাকেন, এবং তাহার তোরঙ্গের মধ্যে এসেন্স, জুতা, রুবিনির ক্যাম্ফর, রঙিন চিঠির কাগজ এবং হারমোনিয়ম-শিক্ষা বহির সঙ্গে একখানি পরিপূর্ণ খাতা নিশীথের গর্ভে ভাবী উষার ন্যায় প্রকাশের প্রতীক্ষায় রহিয়াছে। কিন্তু, মনকে বুঝানো কঠিন এবং এই পল্লিবাসিনী চঞ্চলা মেয়েটির কাছে শ্রীযুক্ত অপূর্ব রায় বি. এ. কিছুতেই পরাভব স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহে।

সন্ধ্যার সময়ে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলে মা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন রে অপু, মেয়ে কেমন দেখলি। পছন্দ হয় তো?"

অপূর্ব কিঞ্চিৎ অপ্রতিভভাবে কহিল, "মেয়ে দেখেছি মা, ওর মধ্যে একটিকে আমার পছন্দ হয়েছে।"

মা আশ্চর্য হইয়া কহিলেন, "তুই আবার কটি মেয়ে দেখলি!"

অবশেষে অনেক ইতস্ততর পর প্রকাশ পাইল, প্রতিবেশিনী শরতের মেয়ে মৃন্ময়ীকে তাঁহার ছেলে পছন্দ করিয়াছে। এত লেখাপড়া শিখিয়া এমনি ছেলের পছন্দ!

প্রথমে অপূর্বর পক্ষে অনেকটা পরিমাণ লজ্জা ছিল, অবশেষে মা যখন প্রবল আপত্তি করিতে লাগিলেন তখন তাহার লজ্জা ভাঙিয়া গেল। সে রোখের মাথায় বলিয়া বসিল, 'মৃন্ময়ীকে ছাড়া আর-কাহাকেও বিবাহ করিব না।' অন্য জড়পুত্তলি মেয়েটিকে সে যতই কল্পনা করিতে লাগিল ততই বিবাহ-সম্বন্ধে তাহার বিষম বিতৃষ্ণার উদ্রেক হইল।

দুই-তিন দিন উভয়পক্ষে মান-অভিমান, অনাহার-অনিদ্রার পর অপূর্বই জয়ী হইল। মা মনকে বোঝাইলেন যে, মৃন্ময়ী ছেলেমানুষ এবং মৃন্ময়ীর মা উপযুক্ত শিক্ষাদানে অসমর্থ, বিবাহের পর তাহার হাতে পড়িলেই তাহার স্বভাবের পরিবর্তন হইবে। এবং ক্রমশ ইহাও বিশ্বাস করিলেন যে, মৃন্ময়ীর মুখখানি সুন্দর। কিন্তু, তখনই আবার তাহার খর্ব কেশরাশি তাঁহার কল্পনাপথে উদিত হইয়া হৃদয় নৈরাশ্যে পূর্ণ করিতে লাগিল, তথাপি আশা করিলেন দৃঢ় করিয়া চুল বাঁধিয়া এবং জবজবে করিয়া তেল লেপিয়া কালে এ ত্রুটি সংশোধন হইতে পারিবে।

পাড়ার লোক সকলেই অপূর্বর এই পছন্দটিকে অপূর্ব-পছন্দ বলিয়া নামকরণ করিল। পাগলী মৃন্ময়ীকে অনেকেই ভালোবাসিত, কিন্তু তাই বলিয়া নিজের পুত্রের বিবাহযোগ্যা বলিয়া কেহ মনে করিত না।

মৃন্ময়ীর বাপ ঈশান মজুমদারকে যথাকালে সংবাদ দেওয়া হইল। সে কোনো একটি স্টীমার কোম্পানির কেরানি-রূপে দূরে নদীতীরবর্তী একটি ক্ষুদ্র স্টেশনে একটি ছোটো টিনের-ছাদ-বিশিষ্ট কুটিরে মাল-ওঠানো-নাবানো এবং টিকিট-বিক্রয়কার্যে নিযুক্ত ছিল।

তাহার মৃন্ময়ীর বিবাহপ্রস্তাবে দুই চক্ষু বহিয়া জল পড়িতে লাগিল। তাহার মধ্যে কতখানি দুঃখ এবং কতখানি আনন্দ ছিল পরিমাণ করিয়া বলিবার কোন উপায় নাই।

কন্যার বিবাহ-উপলক্ষে ঈশান হেড-আপিসের সাহেবের নিকট ছুটি প্রার্থনা করিয়া দরখাস্ত দিল। সাহেব উপলক্ষটা নিতান্তই তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া ছুটি নামঞ্জুর করিয়া দিলেন। তখন, পূজার সময় এক সপ্তাহ দুটি পাইবার সম্ভাবনা জানাইয়া, সে-পর্যন্ত বিবাহ স্থগিত রাখিবার জন্য দেশে চিঠি লিখিয়া দিল। কিন্তু অপূর্বর মা কহিল, 'এই মাসে দিন ভালো আছে, আর বিলম্ব করিতে পারিব না।'

উভয়তই প্রার্থনা অগ্রাহ্য হইলে পর ব্যথিতহৃদয় ঈশান আর-কোনো আপত্তি না করিয়া পূর্বমতো মাল ওজন এবং টিকিট বিক্রয় করিতে লাগিল।

অতঃপর মৃন্ময়ীর মা এবং পল্লীর যত বর্ষীয়সীগণ সকলে মিলিয়া ভাবী কর্তব্য সম্বন্ধে মৃন্ময়ীকে অহর্নিশি উপদেশ দিতে লাগিল। ক্রীড়াসক্তি, দ্রুত গমন, উচ্চহাস্য, বালকদিগের সহিত আলাপ এবং ক্ষুধা-অনুসারে ভোজন সম্বন্ধে সকলেই নিষেধ পরামর্শ দিয়া বিবাহটাকে বিভীষিকারূপে প্রতিপন্ন করিতে সম্পূর্ণ কৃতকার্য হইল। উৎকণ্ঠিত শঙ্কিত হৃদয়ে মৃন্ময়ী মনে করিল, তাহার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং তদবসানে ফাঁসির হুকুম হইয়াছে।

সে দুষ্ট পোনি ঘোড়ার মতো ঘাড় বাঁকাইয়া পিছু হটিয়া বলিয়া বসিল, 'আমি বিবাহ করিব না।'

কহিল, "বাবার কাছে যাবে? সে তো বেশ কথা। চলো, আমি তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি।" মৃন্ময়ী নৌকায় উঠিল।

মাঝি নৌকা ছাড়িয়া দিল। মেঘ করিয়া মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। ভাদ্রমাসের পূর্ণ নদী ফুলিয়া ফুলিয়া নৌকা দোলাইতে লাগিল, মৃন্ময়ীর সমস্ত শরীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া আসিল; অঞ্চল পাতিয়া

সে নৌকার মধ্যে শয়ন করিল এবং এই দুরন্ত বালিকা নদী-দোলায় প্রকৃতির স্নেহপালিত শান্ত শিশুটির মতো অকাতরে ঘুমাইতে লাগিল।

জাগিয়া উঠিয়া দেখিল, সে তাহার শ্বশুরবাড়িতে খাটে শুইয়া আছে। তাহাকে জাগ্রত দেখিয়া ঝি বকিতে আরম্ভ করিল। ঝির কন্ঠস্বরে শাশুড়ি আসিয়া অত্যন্ত কঠিন কঠিন করিয়া বলিতে লাগিলেন। মৃন্ময়ী বিস্ফারিতনেত্রে নীরবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। অবশেষে তিনি যখন তাহার বাপের শিক্ষাদোষের উপর কটাক্ষ করিয়া বলিলেন তখন মৃন্ময়ী দ্রুতপদে পাশের ঘরে প্রবেশ করিয়া ভিতর হইতে শিকল বন্ধ করিয়া দিল।

অপূর্ব লজ্জার মাথা খাইয়া মাকে আসিয়া বলিল, "মা, বউকে দুই-এক দিনের। জন্যে একবার বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিতে দোষ কী।"

মা অপূর্বকে 'ন ভূতো ন ভবিষতি' ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন, এবং দেশে এত মেয়ে থাকিতে বাছিয়া বাছিয়া এই অস্থিদাহকারী দস্যু-মেয়েকে ঘরে আনার জন্য তাহাকে যথেষ্ট গঞ্জনা করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সেদিন সমস্ত দিন বাহিরে ঝড়বৃষ্টি এবং ঘরের মধ্যেও অনুরূপ দুর্যোগ চলিতে লাগিল।

তাহার পরদিন গভীর রাত্রে অপূর্ব মৃন্ময়ীকে ধীরে ধীরে জাগ্রত। করিয়া কহিল, "মৃন্ময়ী, তোমার বাবার কাছে যাবে?"

মৃন্ময়ী সবেগে অপূর্বর হাত চাপিয়া ধরিয়া সচকিত হইয়া কহিল, "যাব।"

অপূর্ব চুপিচুপি কহিল, "তবে এসো, আমরা দুজনে আস্তে আস্তে পালিয়ে যাই। আমি ঘাটে নৌকা ঠিক করে রেখেছি।"

মৃন্ময়ী অত্যন্ত সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে একবার স্বামীর মুখের দিকে চাহিল। তাহার পর তাড়াতাড়ি উঠিয়া কাপড় ছাড়িয়া বাহির হইবার জন্য প্রস্তুত হইল। অপূর্ব তাহার মাতার চিন্তা দূর করিবার জন্য একখানি পত্র রাখিয়া দুইজনে বাহির হইল।

মৃন্ময়ী সেই অন্ধকার রাত্রে জনশূন্য নিস্তব্ধ নির্জন গ্রামপথে এই প্রথম স্বেচ্ছায় আন্তরিক নির্ভরের সহিত স্বামীর হাত ধরিল; তাহার হৃদয়ের আনন্দউদ্বেগ সেই সুকোমল স্পর্শ-যোগে তাহার স্বামীর শিরার মধ্যে সঞ্চারিত হইতে লাগিল।

নৌকা সেই রাত্রেই ছাড়িয়া দিল। অশান্ত হর্ষোচ্ছ্বাস সত্ত্বেও অনতিবিলম্বেই মৃন্ময়ী ঘুমাইয়া পড়িল। পরদিন কী মুক্তি, কী আনন্দ। দুই ধারে কত গ্রাম বাজার শস্যক্ষেত্র বন, দুই ধারে কত নৌকা যাতায়াত করিতেছে। মৃন্ময়ী প্রত্যেক তুচ্ছ বিষয়ে স্বামীকে সহস্রবার করিয়া প্রশ্ন করিতে লাগিল। ওই নৌকায় কী আছে, উহারা কোথা হইতে আসিয়াছে, এই জায়গার নাম কী, এমন-সকল প্রশ্ন যাহার উত্তর অপূর্ব কোনো কলেজের বহিতে পায় নাই এবং যাহা তাহার কলিকাতার অভিজ্ঞতায় কুলাইয়া উঠে না। বন্ধুগণ শুনিয়া লজ্জিত হইবেন, অপূর্ব এই-সকল প্রশ্নের প্রত্যেকটারই উত্তর করিয়াছিল এবং অধিকাংশ উত্তরের সহিত সত্যের ঐক্য হয় নাই। যথা, সে তিলের নৌকাকে তিসির নৌকা, পাঁচবেড়েকে রায়নগর এবং মুন্সেফের আদালতকে জমিদারি কাছারি বলিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত বোধ করে নাই। এবং এই-সমস্ত ভ্রান্ত উত্তরে বিশ্বস্তহৃদয় প্রশ্নকারিণীর সন্তোষের তিলমাত্র ব্যাঘাত জন্মায় নাই।

পরদিন সন্ধ্যাবেলায় নৌকা কুশীগঞ্জে গিয়া পৌছিল। টিনের ঘরে একখানি ময়লা চৌকা-কাঁচের লণ্ঠনে তেলের বাতি জ্বালাইয়া ছোটো ডেস্কের উপর একখানি চামড়ায়-বাধা মস্ত খাতা রাখিয়া গা-খোলা ঈশানচন্দ্র টুলের উপর বসিয়া হিসাব লিখিতেছিলেন। এমন সময় নবদম্পতী ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। মৃন্ময়ী ডাকিল, “বাবা।” সে ঘরে এমন কণ্ঠধ্বনি এমন করিয়া কখনো ধ্বনিত হয় নাই।

ঈশানের চোখ দিয়া দরদর করিয়া অশ্রু পড়িতে লাগিল। সে কী বলিবে, কী করিবে কিছুই ভাবিয়া পাইল না। তাহার মেয়ে এবং জামাই যেন সাম্রাজ্যের যুবরাজ এবং যুবরাজমহিষী; এই-সমস্ত পাটের বস্তার মধ্যে। তাহাদের উপযুক্ত সিংহাসন কেমন করিয়া নির্মিত হইতে পারে ইহাই যেন তাহার দিশাহারা বুদ্ধি ঠিক করিয়া উঠিতে পারিল না।

তাহার পর আহারের ব্যাপার— সেও এক চিন্তা। দরিদ্র কেরানি নিজ হস্তে ডাল ভাতে-ভাত পাক করিয়া খায়— আজ এই এমন আনন্দের দিনে সে কী করিবে, কী খাওয়াইবে। মৃন্ময়ী কহিল, “বাবা, আজ আমরা সকলে মিলিয়া বাঁধিব।” অপূর্ব এই প্রস্তাবে সাতিশয় উৎসাহ প্রকাশ করিল।

ঘরের মধ্যে স্থানাভাব লোকাভাব অন্নাভাব, কিন্তু ক্ষুদ্র ছিদ্র হইতে ফোয়ারা যেমন চতুর্গুণ বেগে উত্থিত হয় তেমনি দারিদ্রের সংকীর্ণ মুখ হইতে আনন্দ পরিপূর্ণ ধারায় উচ্ছ্বসিত হইতে লাগিল।

এমনি করিয়া তিন দিন কাটিল। দুই বেলা নিয়মিত স্টীমার আসিয়া লাগে, কত লোক, কত কোলাহল; সন্ধ্যাবেলায় নদীতীর একেবারে নির্জন হইয়া যায়, তখন কী অবাধ স্বাধীনতা; এবং তিন জনে মিলিয়া নানাপ্রকার জোগাড় করিয়া, ভুল করিয়া, এক করিতে আর-এক করিয়া তুলিয়া রাঁধাবাড়া। তাহার পরে মৃন্ময়ীর বলয়ঝংকৃত স্নেহহস্তের পরিবেশনে শ্বশুর-জামাতার একত্রে আহার এবং গৃহিণীপনার সহস্র ত্রুটি প্রদর্শনপূর্বক মৃন্ময়ীকে পরিহাস ও তাহা লইয়া বালিকার আনন্দকলহ এবং মৌখিক অভিমান। অবশেষে অপূর্ব জানাইল, আর অধিক দিন থাকা উচিত হয় না। মৃন্ময়ী করুণস্বরে আরও কিছু দিন সময় প্রার্থনা করিল। ঈশান কহিল, “কাজ নাই।”

বিদায়ের দিন কন্যাকে বুকের কাছে টানিয়া তাহার মাথায় হাত রাখিয়া অশ্রুগদ্‌গদকণ্ঠে ঈশান কহিল, “মা, তুমি শশুরঘর উজ্জ্বল করিয়া লক্ষ্মী হইয়া থাকিয়ো। কেহ যেন আমার মিনুর কোনো দোষ না ধরিতে পারে।”

মৃন্ময়ী কাঁদিতে কাঁদিতে স্বামীর সহিত বিদায় হইল। এবং ঈশান সেই দ্বিগুণ নিরানন্দ সংকীর্ণ ঘরের মধ্যে ফিরিয়া গিয়া দিনের পর দিন, মাসের পর মাস নিয়মিত মাল ওজন করিতে লাগিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

এই অপরাধীযুগল গৃহে ফিরিয়া আসিলে মা অত্যন্ত গম্ভীরভাবে রহিলেন, কোনো কথাই কহিলেন না। কাহারও ব্যবহারের প্রতি এমন কোনো দোষারোপ করিলেন না যাহা সে ক্ষালন করিতে চেষ্টা করিতে পারে। এই নীরব অভিযোগ, নিস্তব্ধ অভিমান, লৌহভারের মতো সমস্ত ঘরকন্নার উপর অটলভাবে চাপিয়া রহিল।

অবশেষে অসহ্য হইয়া উঠিলে অপূর্ব আসিয়া কহিল, "মা, কালেজ খুলেছে, এখন আমাকে আইন পড়তে যেতে হবে।"

মা উদাসীন ভাবে কহিলেন, "বউয়ের কী করবে।" অপূর্ব কহিল, "বউ এখানেই থাক।"

মা, কহিলেন, "না বাপু, কাজ নাই; তুমি তাকে তোমার সঙ্গেই নিয়ে যাও।" সচরাচর মা অপূর্বকে 'তুই' সম্ভাষণ করিয়া থাকেন।

অপূর্ব অভিমানক্ষুন্নস্বরে কহিল, "আচ্ছা।"

কলিকাতা যাইবার আয়োজন পড়িয়া গেল। যাইবার আগের রাত্রে অপূর্ব বিছানায় আসিয়া দেখিল, মৃন্ময়ী কাঁদিতেছে।

হঠাৎ তাহার মনে আঘাত লাগিল। বিষণ্ণকণ্ঠে কহিল, "মৃন্ময়ী, আমার সঙ্গে কলকাতায় যেতে তোমার ইচ্ছে করছে না?"

মৃন্ময়ী কহিল, "না।"

অপূর্ব জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি আমাকে ভালোবাস না?" এ প্রশ্নের কোনো উত্তর পাইল না। অনেক সময় এই প্রশ্নটির উত্তর অতিশয় সহজ কিন্তু আবার এক-এক সময় ইহার মধ্যে মনস্তত্ত্বঘটিত এত জটিলতার সংস্রব থাকে যে, বালিকার নিকট হইতে তাহার উত্তর প্রত্যাশা করা যায় না।

অপূর্ব প্রশ্ন করিল, "রাখালকে ছেড়ে যেতে তোমার মন কেমন করছে?"

মৃন্ময়ী অনায়াসে উত্তর করিল, "হাঁ।"

বালক রাখালের প্রতি এই বি. এ.-পরীক্ষোত্তীর্ণ কৃতবিদ্য যুবকের সূচির মতো অতি সূক্ষ্ম অথচ অতি সুতীক্ষ্ণ ঈর্ষার উদয় হইল। কহিল, "আমি অনেককাল আর বাড়ি আসতে পাব না।" এই সংবাদ সম্বন্ধে মৃন্ময়ীর কোনো বক্তব্য ছিল না।

"বোধ হয় দু-বৎসর কিম্বা তারও বেশি হতে পারে।"

মৃন্ময়ী আদেশ করিল, "তুমি ফিরে আসবার সময় রাখালের জন্যে একটা তিন-মুখো রজাসের ছুরি কিনে নিয়ে এসো।"

অপূর্ব শয়ান অবস্থা হইতে ঈষৎ উত্থিত হইয়া কহিল, "তুমি তা হলে এইখানেই থাকবে?"

মৃন্ময়ী কহিল, "হাঁ, আমি মায়ের কাছে গিয়ে থাকব।"

অপূর্ব নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "আচ্ছা, তাই থেকো। যতদিন না তুমি আমাকে আসবার জন্যে চিঠি লিখবে, আমি আসব না। খুব খুশি হলে?"

মৃন্ময়ী এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বাহুল্য বোধ করিয়া ঘুমাইতে লাগিল। কিন্তু, অপূর্বর ঘুম হইল না, বালিশ উঁচু করিয়া ঠেসান দিয়া বসিয়া রহিল।

অনেক রাত্রে হঠাৎ চাঁদ উঠিয়া চাঁদের আলো বিছানার উপর আসিয়া পড়িল। অপূর্ব সেই আলোকে মৃন্ময়ীর দিকে চাহিয়া দেখিল। চাহিয়া চাহিয়া মনে হইল, যেন রাজকন্যাকে কে রুপার কাঠি

ছোঁয়াইয়া অচেতন করিয়া রাখিয়া গিয়াছে। একবার কেবল সোনার কাঠি পাইলেই এই নিদ্রিত আত্মাটিকে জাগাইয়া তুলিয়া মালাবদল করিয়া লওয়া যায়। রুপার কাঠি হাস্য, আর সোনার কাঠি অশ্রুজল।

ভোরের বেলায় অপূর্ব মৃন্ময়ীকে জাগাইয়া দিল; কহিল, "মৃন্ময়ী, আমার যাইবার সময় হইয়াছে। চলো তোমাকে তোমার মার বাড়ি রাখিয়া আসি।"

মৃন্ময়ী শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাড়াইলে অপূর্ব তাহার দুই হাত ধরিয়া কহিল, "এখন আমার একটি প্রার্থনা আছে। আমি অনেক সময় তোমার অনেক সাহায্য করিয়াছি, আজ যাইবার সময় তাহার একটি পুরস্কার দিবে?"

মৃন্ময়ী বিস্মিত হইয়া কহিল, "কী।"

অপূর্ব কহিল, "তুমি ইচ্ছা করিয়া, ভালোবাসিয়া আমাকে একটি চুম্বন দাও।"

অপূর্বর এই অদ্ভুত প্রার্থনা এবং গম্ভীর মুখভাব দেখিয়া মৃন্ময়ী হাসিয়া উঠিল। হাস্য সম্বরণ করিয়া মুখ বাড়াইয়া চুম্বন করিতে উদ্যত হইল—কাছাকাছি গিয়া আর পারিল না, খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। এমন দুইবার চেষ্টা করিয়া অবশেষে নিরস্ত হইয়া মুখে কাপড় দিয়া হাসিতে লাগিল। শাসনচ্ছলে অপূর্ব তাহার কর্ণমূল ধরিয়া নাড়িয়া দিল।

অপূর্বর বড় কঠিন পণ। দস্যুবৃত্তি করিয়া কাড়িয়া লুটিয়া লওয়া সে আত্মাবমাননা মনে করে। সে দেবতার ন্যায় সগৌরবে থাকিয়া স্বেচ্ছানীত উপহার চায়, নিজের হাতে কিছুই তুলিয়া লইবে না।

মৃন্ময়ী আর হাসিল না। তাহাকে প্রত্যুষের আলোকে নির্জন পথ দিয়া তাহার মার বাড়ি রাখিয়া অপূর্ব গৃহে আসিয়া মাতাকে কহিল, "ভাবিয়া দেখিলাম, বউকে আমার সঙ্গে কলিকাতায় লইয়া গেলে আমার পড়াশুনার ব্যাঘাত হইবে, সেখানে উহারও কেহ সঙ্গিনী নাই। তুমি তো তাহাকে এ বাড়িতে রাখিতে চাও না, আমি তাই তাহার মার বাড়িতেই রাখিয়া আসিলাম।"

সুগভীর অভিমানের মধ্যে মাতাপুত্রের বিচ্ছেদ হইল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

মার বাড়িতে আসিয়া মৃন্ময়ী দেখিল, কিছুতেই আর মন লাগিতেছে না। সে বাড়ির আগাগোড়া যেন বদল হইয়া গেছে। সময় আর কাটে না। কী করিবে, কোথায় যাইবে, কাহার সহিত দেখা করিবে, ভাবিয়া পাইল না।

মৃন্ময়ীর হঠাৎ মনে হইল, যেন সমস্ত গৃহে এবং সমস্ত গ্রামে কেহ লোক নাই। যেন মধ্যাহ্নে সূর্যগ্রহণ হইল। কিছুতেই বুঝিতে পারিল না, আজ কলিকাতায় চলিয়া যাইবার জন্য এত প্রাণপণ ইচ্ছা করিতেছে, কাল রাত্রে এই ইচ্ছা কোথায় ছিল; কাল সে জানিত না যে, জীবনের যে অংশ পরিহার করিয়া যাইবার জন্য এত মন-কেমন করিতেছিল তৎপূর্বেই তাহার সম্পূর্ণ স্বাদ পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। গাছের পক্কপত্রের ন্যায় আজ সেই বৃন্তচ্যুত অতীত জীবনটাকে ইচ্ছাপূর্বক অনায়াসে দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিল।

গল্পে শুনা যায়, নিপুণ অস্ত্রকার এমন সূক্ষ্ম তরবারি নির্মাণ করিতে পারে যে, তদ্বারা মানুষকে দ্বিখণ্ড করিলেও সে জানিতে পারে না, অবশেষে নাড়া দিলে দুই অর্ধখণ্ড ভিন্ন হইয়া যায়। বিধাতার তরবারি সেইরূপ সূক্ষ্ম, কখন তিনি মৃন্ময়ীর বাল্য ও যৌবনের মাঝখানে আঘাত করিয়াছিলেন সে জানিতে পারে নাই; আজ কেমন করিয়া নাড়া পাইয়া বাল্য-অংশ যৌবন হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িল এবং মৃন্ময়ী বিস্মিত হইয়া ব্যথিত হইয়া চাহিয়া রহিল।

মাতৃগৃহে তাহার সেই পুরাতন শয়নগৃহকে আর আপনার বলিয়া মনে হইল না, সেখানে যে থাকিত সে হঠাৎ আর নাই। এখন হৃদয়ের সমস্ত স্মৃতি সেই আর-একটা বাড়ি, আর-একটা ঘর, আর-একটা শয্যার কাছে গুনগুন করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

মৃন্ময়ীকে আর কেহ বাহিরে দেখিতে পাইল না। তাহার হাস্যধ্বনি আর শুনা যায় না। রাখাল তাহাকে দেখিলে ভয় করে। খেলার কথা মনেও আসে না।

মৃন্ময়ী মাকে বলিল, “মা, আমাকে শ্বশুরবাড়ি রেখে আয়।”

এ দিকে, বিদায়কালীন পুত্রের বিষন্ন মুখ স্মরণ করিয়া অপূর্বর মার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। সে যে রাগ করিয়া বউকে বেহানের বাড়ি রাখিয়া আসিয়াছে ইহা তাহার মনে বড়োই বিঁধিতে লাগিল।

হেনকালে একদিন মাথায় কাপড় দিয়া মৃন্ময়ী ম্লানমুখে শাশুড়ির পায়ের কাছে পড়িয়া প্রণাম করিল। শাশুড়ি তৎক্ষণাৎ ছলছলনেত্রে তাহাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন। মুহূর্তের মধ্যে উভয়ের মিলন হইয়া গেল। শাশুড়ি বধূর মুখের দিকে চাহিয়া আশ্চর্য হইয়া গেলেন। সে মৃন্ময়ী আর নাই। এমন পরিবর্তন সাধারণত সকলের সম্ভব নহে। বৃহৎ পরিবর্তনের জন্য বৃহৎ বলের আবশ্যক।

শাশুড়ি স্থির করিয়াছিলেন, মৃন্ময়ীর দোষগুলি একটি একটি করিয়া সংশোধন করিবেন, কিন্তু আর-একজন অদৃশ্য সংশোধনকর্তা একটি অজ্ঞাত সংক্ষেপ উপায় অবলম্বন করিয়া মৃন্ময়ীকে যেন নূতন জন্ম পরিগ্রহ করাইয়া দিলেন।

এখন শাশুড়িকেও মৃন্ময়ী বুঝিতে পারিল, শাশুড়িও মৃন্ময়ীকে চিনিতে পারিলেন; তরুর সহিত শাখাপ্রশাখার যেরূপ মিল, সমস্ত ঘরকন্না তেমনি পরস্পর অখণ্ডসম্মিলিত হইয়া গেল।

এই-যে একটি গম্ভীর স্নিগ্ধ বিশাল রমণীপ্রকৃতি মৃন্ময়ীর সমস্ত শরীরে ও সমস্ত অন্তরে রেখায় রেখায় ভরিয়া ভরিয়া উঠিল, ইহাতে তাহাকে যেন বেদনা দিতে লাগিল। প্রথম আষাঢ়ের শ্যামসজল নবমেঘের মতো তাহার হৃদয়ে একটি অপূর্ণ বিস্তীর্ণ অভিমানের সঞ্চার হইল। সেই অভিমান তাহার চোখের ছায়াময় সুদীর্ঘ পল্লবের উপর আর-একটি গভীরতর ছায়া নিক্ষেপ করিল। সে মনে-মনে বলিতে লাগিল, ‘আমি আমাকে বুঝিতে পারি নাই বলিয়া তুমি আমাকে বুঝিলে না কেন। তুমি আমাকে শাস্তি দিলে না কেন। তোমার ইচ্ছানুসারে আমাকে চালনা করাইলে না কেন। আমি রাক্ষসী যখন তোমার সঙ্গে কলিকাতায় যাইতে চাহিলাম না, তুমি আমাকে জোর করিয়া ধরিয়া লইয়া গেলে না কেন। তুমি আমার কথা শুনিলে কেন, আমার অনুরোধ মানিলে কেন, আমার অবাধ্যতা সহিলে কেন।’

তাহার পর, অপূর্ব যেদিন প্রভাতে পুষ্করিণীতীরের নির্জন পথে তাহাকে বন্দী করিয়া কিছু না বলিয়া একবার কেবল তাহার মুখের দিকে চাহিয়াছিল, সেই পুষ্করিণী, সেই পথ, সেই তরুতল, সেই প্রভাতের রৌদ্র এবং সেই হৃদয়তারাবনত গভীর দৃষ্টি তাহার মনে পড়িল এবং হঠাৎ সে তাহার সমস্ত অর্থ বুঝিতে পারিল। তাহার পর সেই বিদায়ের দিনের যে চুম্বন অপূর্বর মুখের দিকে অগ্রসর হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল, সেই অসম্পূর্ণ চুম্বন এখন মরুমরীচিকাভিমুখী তৃষার্ত পাখির ন্যায় ক্রমাগত সেই অতীত অবসরের দিকে ধাবিত হইতে লাগিল, কিছুতেই তাহার আর পিপাসা মিটিল না। এখন থাকিয়া থাকিয়া মনে কেবল উদয় হয়, আহা, অমুক সময়টিতে যদি এমন করিতাম, অমুক প্রশ্নের যদি এই উত্তর দিতাম, তখন যদি এমন হইত।

অপূর্বর মনে এই বলিয়া ক্ষোভ জন্মিয়াছিল যে, 'মৃন্ময়ী আমার সম্পূর্ণ পরিচয় পায় নাই।' মৃন্ময়ীও আজ বসিয়া বসিয়া ভাবে, 'তিনি আমাকে কী মনে করিলেন, কী বুঝিয়া গেলেন।' অপূর্ব তাহাকে যে দুরন্ত চপল অবিবেচক নির্বোধ বালিকা বলিয়া জানিল, পরিপূর্ণ হৃদয়ামৃতধারায় প্রেমপিপাসা মিটাইতে সক্ষম রমণী বলিয়া পরিচয় পাইল না, ইহাতেই সে পরিতাপে লজ্জায় ধিক্কারে পীড়িত হইতে লাগিল। চুম্বনের এবং সোহাগের সে ঋণগুলি অপূর্বর মাথার বালিশের উপর পরিশোধ করিতে লাগিল। এমনি ভাবে কতদিন কাটিল।

অপূর্ব বলিয়া গিয়াছিল, 'তুমি চিঠি না লিখিলে আমি বাড়ি ফিরিব না। মৃন্ময়ী তাহাই স্মরণ করিয়া একদিন ঘরে দ্বার রুদ্ধ করিয়া চিঠি লিখিতে বসিল। অপূর্ব তাহাকে যে সোনালি-পাড়-দেওয়া রঙিন কাগজ দিয়াছিল তাহাই বাহির করিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। খুব যত্ন করিয়া ধরিয়া লাইন বাকা করিয়া অঙ্গুলিতে কালি মাখিয়া অক্ষর ছোটো বড়ো করিয়া উপরে কোনো সম্বোধন না করিয়া একেবারে লিখিল, 'তুমি আমাকে চিঠি লিখ না কেন। তুমি কেমন আছ, আর তুমি বাড়ি এসো।' আর কী বলিবার আছে কিছুই ভাবিয়া পাইল না। আসল বক্তব্য কথা সবগুলিই বলা হইয়া গেল বটে, কিন্তু মনুষ্যসমাজে মনের ভাব আর-একটু বাহুল্য করিয়া প্রকাশ করা আবশ্যক। মৃন্ময়ীও তাহা বুঝিল; এইজন্য আরও অনেকক্ষণ ভাবিয়া ভাবিয়া আর কয়েকটি নূতন কথা যোগ করিয়া দিল—'এইবার তুমি আমাকে চিঠি লিখো, আর কেমন আছ লিখো, আর বাড়ি এসো, মা ভালো আছেন, বিশু পুটি ভালো আছে, কাল আমাদের কালো গোরুর বাছুর হয়েছে।' এই বলিয়া চিঠি শেষ করিল। চিঠি লেফাফায় মুড়িয়া প্রত্যেক অক্ষরটির উপর একটি ফোঁটা করিয়া মনের ভালোবাসা দিয়া লিখিল, শ্রীযুক্ত বাবু অপূর্বকৃষ্ণ রায়। ভালোবাসা যতই দিক, তবু লাইন সোজা, অক্ষর সুছাঁদ এবং বানান শুদ্ধ হইল না।

লেফাফায় নামটুকু ব্যতীত আরও যে কিছু লেখা আবশ্যক মৃন্ময়ীর তাহা জানা ছিল না। পাছে শাশুড়ি অথবা আর-কাহারও দৃষ্টিপথে পড়ে, সেই লজ্জায় চিঠিখানি একটি বিশ্বস্ত দাসীর হাত দিয়া ডাকে পাঠাইয়া দিল।

বলা বাহুল্য, এ পত্রের কোনো ফল হইল না, অপূর্ব বাড়ি আসিল না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

মা দেখিলেন, ছুটি হইল তবু অপূর্ব বাড়ি আসিল না। মনে করিলেন এখনও সে তাঁহার উপর রাগ করিয়া আছে।

মৃন্ময়ীও স্থির করিল, অপূর্ব তাহার উপর বিরক্ত হইয়া আছে, তখন আপনার চিঠিখানি মনে করিয়া সে লজ্জায় মরিয়া যাইতে লাগিল। সে চিঠিখানা যে কত তুচ্ছ, তাহাতে যে কোনো কথাই লেখা হয় নাই, তাহার মনের ভাব যে কিছুই প্রকাশ করা হয় নাই, সেটা পাঠ করিয়া অপূর্ব যে মৃন্ময়ীকে আরও ছেলেমানুষ মনে করিতেছে, মনে মনে আরও অবজ্ঞা করিতেছে, ইহা ভাবিয়া সে শরবিদ্ধের ন্যায় অন্তরে অন্তরে ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। দাসীকে বার বার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সে চিঠিখানা তুই কি ডাকে দিয়ে এসেছিস।" দাসী তাহাকে সহস্রবার আশ্বাস দিয়া কহিল, "হা গো, আমি নিজের হাতে বাক্সের মধ্যে ফেলে দিয়েছি, বাবু তা এতদিনে কোন্‌ কালে পেয়েছে।"

অবশেষে অপূর্বর মা একদিন মৃন্ময়ীকে ডাকিয়া কহিলেন, "বউমা, অপু অনেকদিন তো বাড়ি এল না, তাই মনে করছি, কলকাতায় গিয়ে তাকে দেখে আসি গে। তুমি সঙ্গে যাবে?" মৃন্ময়ী সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িল এবং ঘরের মধ্যে আসিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া বিছানার উপর পড়িয়া বালিশখানা বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া হাসিয়া নড়িয়া-চড়িয়া মনের আবেগ উন্মুক্ত করিয়া দিল; তাহার পর ক্রমে গম্ভীর হইয়া, বিষণ্ন হইয়া, আশঙ্কায় পরিপূর্ণ হইয়া, বসিয়া কঁাদিতে লাগিল।

অপূর্বকে কোনো খবর না দিয়া এই দুটি অনুতপ্তা রমণী তাহার প্রসন্নতা ভিক্ষা করিবার জন্য কলিকাতায় যাত্রা করিল। অপূর্বর মা সেখানে তাহার জামাইবাড়িতে গিয়া উঠিলেন।

সেদিন মৃন্ময়ীর পত্রের প্রত্যাশায় নিরাশ হইয়া সন্ধ্যাবেলায় অপূর্ব প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া নিজেই তাহাকে পত্র লিখিতে বসিয়াছে। কোনো কথাই পছন্দমতো হইতেছে না। এমন একটা সম্বোধন খুঁজিতেছে যাহাতে ভালোবাসাও প্রকাশ হয় অথচ অভিমানও ব্যক্ত করে; কথা না পাইয়া মাতৃভাষার উপর অশ্রদ্ধা দৃঢ়তর হইতেছে। এমন সময় ভগ্নীপতির নিকট হইতে পত্র পাইল, 'মা আসিয়াছেন, শীঘ্র

আসিবে এবং রাত্রে এইখানেই আহারাদি করিবে। সংবাদ সমস্ত ভালো।' শেষ আশ্বাস সত্ত্বেও অপূর্ব অমঙ্গলশঙ্কায় বিমর্ষ হইয়া উঠিল। অবিলম্বে ভগ্নীর বাড়ি গিয়া উপস্থিত হইল।

সাক্ষাৎমাত্রই মাকে জিজ্ঞাসা করিল, "মা, সব ভালো তো?" মা কহিলেন, "সব ভালো। তুই ছুটিতে বাড়ি গেলি না, তাই আমি তোকে নিতে এসেছি।"

অপূর্ব কহিল, "সেজন্য এত কষ্ট করিয়া আসিবার কী আবশ্যক ছিল, আইন পরীক্ষার পড়াশুনা—" ইত্যাদি।

আহারের সময় ভগ্নী জিজ্ঞাসা করিল, "দাদা, এবার বউকে তোমার সঙ্গে আনলে না কেন।"

দাদা গম্ভীরভাবে কহিতে লাগিল, "আইনের পড়াশুনা ইত্যাদি।"

ভগ্নীপতি হাসিয়া কহিল, "ও-সমস্ত মিথ্যা ওজর। আমাদের ভয়ে আনতে সাহস হয় না।"

ভগ্নী কহিল, "ভয়ংকর লোকটাই বটে। ছেলেমানুষ হঠাৎ দেখলে আচমকা আঁৎকে উঠতে পারে।"

এইভাবে হাস্যপরিহাস চলিতে লাগিল, কিন্তু অপূর্ব অত্যন্ত বিমর্ষ হইয়া রহিল। কোনো কথা তাহার ভালো লাগিতেছিল না। তাহার মনে হইতেছিল, সেই যখন মা কলিকাতায় আসিলেন তখন মৃন্ময়ী ইচ্ছা করিলে অনায়াসে তাহার সহিত আসিতে পারিত। বোধ হয়, মা তাহাকে সঙ্গে আনিবার চেষ্টাও করিয়াছিলেন, কিন্তু সে সম্মত হয় নাই। এ সম্বন্ধে সংকোচবশত মাকে কোনো প্রশ্ন করিতে পারিল না— সমস্ত মানবজীবন এবং বিশ্বরচনাটা আগাগোড়া ভ্রান্তিসংকুল বলিয়া বোধ হইল।

আহারান্তে প্রবলবেগে বাতাস উঠিয়া বিষম বৃষ্টি আরম্ভ হইল।

ভগ্নী কহিল, "দাদা, আজ আমাদের এইখানেই থেকে যাও।"

দাদা কহিল, "না, বাড়ি যেতে হবে; কাজ আছে।"

ভগ্নীপতি কহিল, "রাত্রে তোমার আবার এত কাজ কিসের। এখানে এক রাত্রি থেকে গেলে তোমার তো কারও কাছে জবাবদিহি করতে হবে, তোমার ভাবনা কী।"

অনেক পীড়াপীড়ির পর বিস্তর অনিচ্ছা-সত্ত্বে অপূর্ব সে রাত্রি থাকিয়া যাইতে সম্মত হইল।

ভগ্নী কহিল, "দাদা, তোমাকে শ্রান্ত দেখাচ্ছে, তুমি আর দেরি কোরো না চলো শুতে চলো।"

অপূর্বরও সেই ইচ্ছা। শয্যাতলে অন্ধকারের মধ্যে একলা হইতে পারিলে বাঁচে, কথার উত্তর প্রত্যুত্তর করিতে ভালো লাগিতেছে না।

শয়নগৃহের দ্বারে আসিয়া দেখিল ঘর অন্ধকার। ভগ্নী কহিল, "বাতাসে আলো নিবে গেছে দেখছি। তা, আলো এনে দেব কি, দাদা।"

অপূর্ব কহিল, "না, দরকার নেই, আমি রাত্রে আলো রাখি নে।"

ভগ্নী চলিয়া গেলে অপূর্ব অন্ধকারে সাবধানে খাটের অভিমুখে গেল।

থাটে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইতেছে এমন সময়ে হঠাৎ বলয়নিক্কণশব্দে একটি সুকোমল বাহুপাশ তাহাকে সুকঠিন বন্ধনে বাঁধিয়া ফেলিল এবং একটি পুষ্পপুটতুল্য ওষ্ঠাধর দস্যুর মতো আসিয়া পড়িয়া অবিরল অশ্রুজলসিক্ত আবেগপূর্ণ চুম্বনে তাহাকে বিস্ময়প্রকাশের অবসর দিল না। অপূর্ব প্রথমে চমকিয়া উঠিল, তাহার পর বুঝিতে পারিল, অনেক দিনের একটি হাস্যবাধায়অসম্পন্ন চেষ্টা আজ অশ্রুজলধারায় সমাপ্ত হইল।

আশ্বিন ১৩০০

পাদটীকা

সৈয়দ মুজতবা আলী

গত শতকের শেষ আর এই শতকের গোড়ার দিকে আমাদের দেশের টোলগুলো মড়ক লেগে প্রায় সম্পূর্ণ উজাড় হয়ে যায়। পাঠান-মোগল আমলে যে দুর্দৈব ঘটেনি ইংরাজ রাজত্বে সেটা প্রায় আমাদেরই চোখের সামনে ঘটল। অর্থনৈতিক চাপে পড়ে দেশের কর্তাব্যক্তিরা ছেলে-ভাইপোকে টোলে না পাঠিয়ে ইংরেজি ইস্কুলে পাঠাতে আরম্ভ করলেন। চতুর্দিকে ইংরেজি শিক্ষার জয়-জয়কার পড়ে গেল—সেই ডামাডোলে টোল মরল, আর বিস্তর কাব্যতীর্থ বেদান্তবাগীশ না খেয়ে মারা গেলেন।

এবং তার চেয়েও হৃদয়বিদারক হলো তাঁদের অবস্থা, যাঁরা কোনো গতিকে সংস্কৃত, বাংলার শিক্ষক হয়ে হাই স্কুলগুলোতে স্থান পেলেন। এঁদের আপন আপন বিষয়ে অর্থাৎ, কাব্য, অলংকার, দর্শন ইত্যাদিতে এঁদের পাণ্ডিত্য ছিল অন্য শিক্ষকদের তুলনায় অনেক বেশি, কিন্তু সম্মান এবং পারিশ্রমিক এঁরা পেতেন সবচেয়ে কম। শুনেছি কোনো কোনো স্কুলে পণ্ডিতের মাইনে চাপরাশীর চেয়েও কম ছিল।

আমাদের পণ্ডিতমশাই তর্কালঙ্কার না কাব্যবিশারদ ছিলেন আমার আর ঠিক মনে নেই; কিন্তু এ কথা মনে আছে যে পণ্ডিতসমাজে তাঁর খ্যাতি ছিল প্রচুর এবং তাঁর পিতৃপিতামহ চতুর্দশ পুরুষ শুধু যে ভারতীয় সংস্কৃতির একনিষ্ঠ সাধক ছিলেন তা নয়, তাঁরা কখনো পরান্ন ভক্ষণ করেননি—পালপরব শ্রাদ্ধনিমন্ত্রণে পাত পাড়ার তো কথাই ওঠে না।

বাঙলা ভাষার প্রতি পণ্ডিতমশাইয়ের ছিল অবিচল, অকৃত্রিম অশ্রদ্ধা-ঘৃণা বললেও হয়তো বাড়িয়ে বলা হয় না। বাঙলাতে যেটুকু খাঁটি সংস্কৃত বস্তু আছে তিনি মাত্র সেইটুকু পড়াতে রাজি হতেন—অর্থাৎ কৃৎ, তদ্ধিত, সন্ধি এবং সমাস। তাও বাঙলা সমাস না। আমি একদিন বাঙলা রচনায় 'দোলা-লাগা', 'পাখী-জাগা' উদ্ধৃত করেছিলুম বলে তিনি আমার দিকে দোয়াত ছুড়ে মেরেছিলেন। ক্রিকেট ভালো খেলা—সে দিন কাজে লেগে গিয়েছিল। এবং তারপর মুহূর্তেই বি পূর্বক, আ পূর্বক, ঘ্রাধাতুকে উত্তর দিয়ে সংস্কৃত ব্যাঘ্রকে ঘায়েল করতে পেরেছিলুম বলে তিনি আশীর্বাদ করে বলেছিলেন, 'এই দণ্ডেই তুই স্কুল ছেড়ে চতুষ্পাঠীতে যা। সেখানে তোর সত্য বিদ্যা হবে।'

কিন্তু পণ্ডিতমশাই যত না পড়াতেন, তার চেয়ে বকতেন ঢের বেশি এবং টেবিলের উপর পা দু'খানা তুলে দিয়ে ঘুমুতেন সবচেয়ে বেশি। বেশ নাক ডাকিয়ে এবং হেডমাস্টারকে একদম পরোয়া না করে। কারণ হেডমাস্টার তাঁর কাছে ছেলেবেলায় সংস্কৃত পড়েছিলেন এবং তিনি যে লেখাপড়ায় সর্বাঙ্গনিন্দনীয় হস্তীমূর্খ ছিলেন সে কথাটি পণ্ডিতমশাই বারম্বার অহরহ সর্বত্র উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করতেন। আমরা সে কাহিনী শুনে বিমলানন্দ উপভোগ করতুম, আর পণ্ডিতমশাইকে খুশি করবার পন্থা বাড়ন্ত হলে ঐ বিষয়টি নূতন করে উত্থাপন করতুম।

আমাকে পণ্ডিতমশাই একটু বেশি স্নেহ করতেন। তার কারণ বিদ্যাসাগরী বাঙলা লেখা ছিল আমার বাই; 'দোলা-লাগা, 'পাখী-জাগা'ই আমার বর্ণাশ্রম ধর্ম পালনে একমাত্র গোমাংস ভক্ষণ। পণ্ডিতমশাই যে আমাকে সবচেয়ে বেশি স্নেহ করতেন তার প্রমাণ তিনি দিতেন আমার উপর অহরহ নানাপ্রকার কটুকাটব্য বর্ষণ করে। 'অনার্য', 'শাখামৃগ', দ্রাবিড়সম্ভূত' কথাগুলো ব্যবহার না করে তিনি আমাকে সাধারণত সম্বোধন করতেন না; তা ছাড়া এমন সব অশ্লীল কথা বলতেন যে তার সঙ্গে তুলনা দেবার মতো জিনিস আমি দেশ বিদেশে কোথাও শুনিনি। তবে এ কথাও স্বীকার করতে হবে যে পণ্ডিতমশাই শ্লীল অশ্লীল উভয় বস্তুই একই সুরে একই পরিমাণে ঝেড়ে যেতেন, সম্পূর্ণ অচেতন, বীতরাগ এবং লাভালাভের আশা বা ভয় না করে! এবং তাঁর অশ্লীলতা মার্জিত না হলেও অত্যন্ত বিদগ্ধরূপেই দেখা দিত বলে আমি বহু অভিজ্ঞতার পর এখনো মনস্থির করতে পারিনি যে, সেগুলো শুনতে পেয়ে আমার লাভ না ক্ষতি, কোনটা বেশি হয়েছে।

পণ্ডিত মহাশয়ের বর্ণ ছিল শ্যাম। তিন মাসে একদিন দাড়ি-গোঁফ কামাতেন এবং পরতেন হাঁটু-জোকা ধুতি। দেহের উত্তমার্ধে একখানা দড়ি প্যাঁচানো থাকতো—অজ্ঞেরা বলত সেটা নাকি দড়ি নয়, চাদর। ক্লাসে ঢুকেই তিনি সেই দড়িখানা টেবিলের উপর রাখতেন, আমাদের দিকে রোষকষায়িত লোচনে তাকাতেন, আমাদের বিদ্যালয়ে না এসে যে চাষ করতে যাওয়াটা সমধিক সমীচীন সে কথাটা দ্বি'সহস্রবারের মতো স্মরণ করিয়ে দিতে দিতে পা দুখানা টেবিলের উপর লম্বমান করতেন। তারপর যে কোনো একটা অজুহাত ধরে আমাদের এক চোট বকে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়তেন। নিতান্ত যে দিন কোনো অজুহাতই পেতেন না ধর্মসাক্ষী সে কসুর আমাদের নয়—সেদিন দু'চারটে কৃৎ-তদ্ধিত সম্বন্ধে আপন মনে—কিন্তু বেশ জোর গলায় আলোচনা করে উপসংহারে বলতেন; কিন্তু এই মূর্খদের বিদ্যাদান করবার প্রচেষ্টা বন্ধ্যাগমনের মতো নিষ্ফল নয় কি?' তারপর কখনো আপন গতাসু চতুষ্পাঠীর কথা স্মরণ করে বিড়বিড় করে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে অভিশাপ দিতেন, কখনো দীর্ঘশ্বাস ফেলে টানাপাখার দিকে একদৃষ্টে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে ঘুমিয়ে পড়তেন।

শুনেছি, ঋগ্বেদে আছে, যমপত্নী যমী যখন যমের মৃত্যুতে অত্যন্ত শোকাতুরা হয়ে পড়েন তখন দেবতারা তাঁকে কোনো প্রকারে সান্ত্বনা না দিতে পেরে শেষটায় তাঁকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছিলেন। তাই আমার বিশ্বাস পণ্ডিতমশায়ের টোল কেড়ে নিয়ে দেবতারা তাঁকে সান্ত্বনা দেবার জ্য অহরহ ঘুম পাড়িয়ে দিতেন। কারণ এ রকম দিনযামিনী সায়ংপ্রাতঃ শিশিরবসন্তে বেঞ্চি চৌকিতে যতত্রত অকাতরে ঘুমিয়ে পড়তে পারাটা দেবতার দান—এ কথা অস্বীকার করার জো নেই।

বহু বৎসর হয়ে গিয়েছে, সেই ইস্কুলের সামনে সুরমা নদী দিয়ে অনেক জল বয়ে গিয়েছে; কিন্তু আজও যখন তাঁর কথা ব্যাকরণ সম্পর্কে মনে পড়ে তখন তাঁর যে ছবিটি আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে সেটি তাঁর জাগ্রত অবস্থার নয়; সে ছবিতে দেখি, টেবিলের উপর দু'পা-তোলা, মাথা একদিকে ঝুলে পড়া টিকিতে দোলা-লাগা কাষ্ঠাসন শরশয্যায় শায়িত ভারতীয় ঐতিহ্যের শেষ কুমার ভীষ্মদেব। কিন্তু ছিঃ, আবার 'দোলা-লাগা' সমাস ব্যবহার করে পণ্ডিতমশায়ের প্রেতাত্মাকে ব্যথিত করি কেন?

সে সময়ে আসামের চিফ-কমিশনার ছিলেন এন ডি বিটসন বেল। সাহেবটির মাথায় একটু ছিট ছিল। প্রথম পরিচয়ে তিনি সবাইকে বুঝিয়ে বলতেন যে তার নাম, আসলে 'নন্দদুলাল বাজায় ঘন্টা'। 'এনডি'তে হয় 'নন্দদুলাল' আর বিটসন বেল অর্থ 'বাজায় ঘন্টা'—দুয়ে মিলে হয় 'নন্দদুলাল বাজায় ঘন্টা'।

সেই নন্দদুলাল এসে উপস্থিত হলেন আমাদের শহরে।

ক্লাসের জ্যাঠা ছেলে ছিল পদ্মলোচন। সেই একদিন খবর দিল লাট সাহেব আসছেন স্কুল পরিদর্শন করতে—পদ্মর ভগ্নিপতি লাটের টুর ক্লার্ক না কি, সে তাঁর কাছ থেকে পাকা খবর পেয়েছে।

লাটের ইস্কুল আগমন অবিশ্রিত আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা নয়। একদিক দিয়ে যেমন বলা নেই, কওয়া নেই, হঠাৎ কসুর বিনা-কসুরে লাট আসার উত্তেজনায় খিটখিটে মাস্টারদের কাছ থেকে কপালে কিলটা চড়টা আছে, অন্যদিকে তেমনি লাট চলে যাওয়ার পর তিন দিনের ছুটি।

হেডমাস্টারের মেজাজ যখন সক্কলের প্রাণ ভাজা ভাজা করে ছাই বানিয়ে ফেলার উপক্রম করেছে এমন সময় খবর পাওয়া গেল, শুক্কুরবার দিন হুজুর আসবেন।

ইস্কুল শুরু হওয়ার এক ঘন্টা আগে আমরা সেদিন হাজিরা দিলুম। হেডমাস্টার ইস্কুলের সর্বত্র চড়কিবাজীর মতন তুর্কি-নাচন নাচছেন। যেদিকে তাকাই সে দিকেই হেডমাস্টার। নিশ্চয়ই তাঁর

অনেকগুলো যমজ ভাই আছেন, আর ইস্কুল সামলাবার জন্য সেদিন সব কজনকে রিকুইজিশন করে নিয়ে এসেছেন।

পদ্মলোচন বললে, ‘কমন রুমে গিয়ে মজাটা দেখে আয়।’

‘কেন, কী হয়েছে?’

‘দেখেই আয় না ছাই।’

পদ্ম আর যা করে করুক কখনো বাসি খবর বিলোয় না। হেডমাস্টারের চড়ের ভয় না মেনে কমন রুমের কাছে গিয়ে জানলা দিয়ে দেখি, অবাক কাণ্ড! আমাদের পণ্ডিত মশাই একটা লম্বা হাতা আনকোরা নূতন হলদে রঙের গেঞ্জি পরে বসে আছেন আর বাদবাকি মাস্টাররা কলরব করে সে গেঞ্জিটার প্রশংসা করছেন। নানা মুনি নানা গুণকীর্তন করছেন; কেউ বলছেন, পণ্ডিতমশাই কি বিচক্ষণ লোক, বেজায় সস্তায় দাও মেরেছে (গাঁজা, পণ্ডিতমশায়ের সাংসারিক বুদ্ধি একরত্তি ছিল না), কেউ বলছেন আহা, যা মানিয়েছে (হাতী, পণ্ডিতমশাইকে সার্কাসের সঙের মতো দেখাচ্ছিল), কেউ বলছেন, যা ফিট করেছে (মরে যাই, গেঞ্জির আবার ফিট অফিট কি?)।

শেষটায় পণ্ডিতমশায়ের ইয়ার মৌলভী সায়েব দাড়ি দুলিয়ে বললেন, ‘বুঝলে ভশ্চাচ, এ রকম উমদা গেঞ্জি স্রেফ দু'খানা তৈরি হয়েছিল, তারই একটা কিনেছিল পঞ্চম জর্জ, আর দুসরাটা কিনলে তুমি। এ দুটো বানাতে গিয়ে কোম্পানি দেউলে হয়ে গিয়েছে, আর কারো কপালে এ রকম গেঞ্জি নেই।’

চাপরাশী নিত্যানন্দ দূর থেকে ইশারায় জানাল, ‘বাবু আসছেন।’

তিন লম্ফে ক্লাসে ফিরে গেলুম।

সেকেন্ড পিরিয়ডে বাঙলা। পণ্ডিতমশাই আসতেই আমরা সবাই ত্রিশ গাল হেসে গেঞ্জিটার দিকে তাকিয়ে রইলুম। ইতিমধ্যে রেবতী খবর দিল যে শাস্ত্রে সেলাই করা কাপড় পরা বারণ বলে পণ্ডিতমশাই পাঞ্জাবী শার্ট পরেন না; কিন্তু লাট সায়েব আসছেন, শুধু গায়ে ইস্কুল আসা চলবে না, তাই গেঞ্জি পরে এসেছেন। গেঞ্জি বোনা জিনিস, সেলাই করা কাপড়ের পাপ থেকে পণ্ডিতমশাই কৌশলে নিষ্কৃতি পেয়েছেন।

গেঞ্জি দেখে আমরা এতই মুগ্ধ যে পণ্ডিতমশায়ের গালাগাল, বোয়াল-চোখ সব কিছুর জন্যই আমরা তখন তৈরি কিন্তু কেন জানিনে তিনি তাঁর রুটিন মাফিক কিছুই করলেন না। বকলেন না, চোখ লাল করলেন না, লাট আসছেন, কাজেই টেবিলে ঠ্যাং তোলার কথাও উঠতে পারে না। তিনি চেয়ারের উপর অত্যন্ত বিরস বদনে বসে রইলেন।

পদ্মলোচনের ডর ভয় কম। আহ্লাদে ফেটে গিয়ে বলল, 'পণ্ডিতমশাই, গেঞ্জিটা কদ্দিয়ে কিনলেন?' আশ্চর্য, পণ্ডিতমশাই খ্যাঁক খ্যাঁক করে উঠলেন না, নির্জীব কণ্ঠে বললেন, 'পাঁচ সিকে।'

আধ মিনিট যেতে না যেতেই পণ্ডিতমশাই দুহাত দিয়ে ক্ষণে হেথায় চুলকান ক্ষণে হোথায় চুলকান। পিঠের অসম্ভব অসম্ভব জায়গায় কখনো ডান হাত, কখনো বাঁ হাত দিয়ে চুলকানোর চেষ্টা করেন, কখনো মুখ বিকৃত করে গেঞ্জির ভিতর হাত চালান করে পাগলের মতো এখানে ওখানে খ্যাঁস খ্যাঁস করে খামচান।

একে তো জীবন-ভর উত্তমাঙ্গে কিছু পরেননি, তার উপর গেঞ্জি, সেও আবার একদম নূতন কোরা গেঞ্জি।

বাচ্চা ঘোড়ার পিঠে পয়লা জিন লাগালে সে যে-রকম আকাশের দিকে দু'পা তুলে তড়পায়, শেষটায় পণ্ডিতমশায়ের সেই অবস্থা হলো। কখনো করুণ কণ্ঠে অস্ফুট আর্তনাদ করেন, 'রাধামাধব, এ কী গব্ব-যন্তণা, কখনো এক হাত দিয়ে আরেক হাত চেপে ধরে, দাঁত কিড়মিড় খেয়ে আত্মসম্বরণ করার চেষ্টা করেন—লাট সায়েবের সামনে তো সর্বাঙ্গ আঁচড়ানো যাবে না।

শেষটায় থাকতে না পেরে আমি উঠে বললুম, 'পণ্ডিত মশাই, আপনি গেঞ্জিটা খুলে ফেলুন। লাট সায়েব এলে আমি জানলা দিয়ে দেখতে পাব। তখন না হয় ফের পরে নেবেন।'

বললেন, 'ওরে জড়ভরত, গব্ব-যন্তণাটা খুলছি নে, পরার অভ্যেস হয়ে যাবার জন্য।' আমি হাত জোড় করে বললুম, 'একদিনে অভ্যেস হবে না পণ্ডিতমশাই, ওটা আপনি খুলে ফেলুন।'

আসলে পণ্ডিতমশাইয়ের মতলব ছিল গেঞ্জিটা খুলে ফেলারই; শুধু আমাদের কারো কাছ থেকে একটু মরাল সাপোর্টের অপেক্ষায় এতক্ষণ বসে ছিলেন। তবু সন্দেহ ভরা চোখে বললেন, 'তুই তো একটা আস্ত মর্কট—শেষটায় আমাকে ডোবাবি না তো? তুই যদি হুঁশিয়ার না করিস, আর লাট যদি এসে পড়েন?'

আমি ইহলোক পরলোক সর্বলোক তুলে দিব্যি, কিরে, কসম খেলুম।

পণ্ডিতমশাই গেঞ্জিটা খুলে টেবিলের উপর রেখে সেটার দিকে যে দৃষ্টি হানলেন, তাঁর টিকিটি কেউ কেটে ফেললেও তিনি তার দিকে এর চেয়ে বেশি ঘৃণা মাখিয়ে তাকাতে পারতেন না। তারপর লুপ্তদেহটা ফিরে পাওয়ার আনন্দে প্রাণভরে সর্বাঙ্গ খামচালেন। বুক পিঠ ততক্ষণে বেগ্নি রঙের আঁজিতে ভর্তি হয়ে গিয়েছে।

এরপর আর কোনো বিপদ ঘটল না। পণ্ডিতমশাই থেকে থেকে রাধামাধবকে স্মরণ করলেন, আমি জানলা দিয়ে তাকিয়ে রইলুম, আর সবাই গেঞ্জিটার নাম, ধাম, কোন দোকানে কেনা, সস্তা না আক্রা, তাই নিয়ে আলোচনা করল।

আমি সময়মতো ওয়ার্নিং দিলুম। পণ্ডিতমশাই আবার তাঁর 'গব্বযন্তণাটা' উত্তমাঙ্গে মেখে নিলেন।

লাট এলেন; সঙ্গে ডেপুটি কমিশনার, ডাইরেক্টর, ইনসপেক্টর, হেডমাস্টার, নিত্যানন্দ—আর লাট সায়েবের এডিসি ফেডিসি না কি সব বারান্দায় জটলা পাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। 'হ্যালো পানডিট' বলে সায়েব হাত বাড়ালেন। রাজসম্মান পেয়ে পণ্ডিতমশায়ের সর্ব যন্ত্রণা লাঘব হলো। বারবার ঝুঁকে ঝুঁকে সায়েবকে সেলাম করলেন—এই অনাদৃত পণ্ডিত শ্রেণী সামান্যতম গতানুগতিক সম্মান পেলেও যে কি রকম বিগলিত হতেন তা তাঁদের সে সময়কার চেহারা না দেখলে অনুমান করার উপায় নেই।

হেডমাস্টার পণ্ডিতমশায়ের কৃৎ-তদ্ধিতের বাই জানতেন, তাই নির্ভয়ে ব্যাকরণের সর্বোচ্চ নভঃস্থলে উড্ডীয়মান হয়ে বিহঙ্গ' শব্দের তত্ত্বানুসন্ধান করলেন। আমরা জন দশেক এক সঙ্গে চেঁচিয়ে বললুম, 'বিহায়স পূর্বক গম ধাতু খ' লাট সায়েব হেসে বললেন, 'ওয়ান এ্যাট ও টাইম, প্লিজ'। লাট সাহেব আমাদের বলল, 'প্লিজ একি কাণ্ড।' তখন আবার আর কেউ রা কাড়ে না। হেডমাস্টার শুধালেন 'বিহঙ্গ', আমরা চুপ, —তখনো প্লিজের ধকল কাটেনি। শেষটায় ব্যাকরণে নিরেট পাঁঠা যতেটা আমাদের উত্তর আগ শুনে নিয়েছিল বলে ক্লাসে নয়, দেশে নাম করে ফেলল—আমরা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলুম।

লাট সায়েব ততক্ষণে হেডমাস্টারের সঙ্গে 'পণ্ডিত' শব্দের মূল নিয়ে ইংরেজিতে আলোচনা জুড়ে দিয়েছেন। হেডমাস্টার কি বলেছিলেন জানিনে, তবে রবীন্দ্রনাথ নাকি পণ্ডিতদের ধর্মে জয়শীলতার প্রতি বিদ্রূপ করে বলেছিলেন, যার সব কিছু পণ্ড হয়ে গিয়েছে সেই পণ্ডিত!

ইংরেজ শাসনের ফলে আমাদের পণ্ডিতদের সর্বনাশ, সর্বস্ব পণ্ডের ইতিহাস হয়তো রবীন্দ্রনাথ জানতেন না,—না হলে ব্যঙ্গ করার পূর্বে হয়তো একটু ভেবে দেখতেন।

সে কথা থাক। লাট সায়েব চলে গিয়েছেন, যাবার পূর্বে পণ্ডিতমশায়ের দিকে একখানা মোলায়েম নড করাতে তিনি গর্বে চৌচির হয়ে ফেটে যাবার উপক্রম। আনন্দের আতিশয্যে নতুন গেঞ্জির চুলকুনির কথা পর্যন্ত ভুল গিয়েছেন। আমরা দু তিনবার স্মরণ করিয়ে দেবার পর গেঞ্জিটা তাঁর শ্রীঅঙ্গ থেকে ডিগ্রেডেড হলো।

তিন দিন ছুটির পর ফের বাঙলা ক্লাস বসেছে। পণ্ডিতমশাই টেবিলের উপর পা তুলে দিয়ে ঘুমুচ্ছেন, না শুধু চোখ বন্ধ করে আছেন ঠিক ঠাহর হয়নি বলে তখনো গোলমাল আরম্ভ হয়নি।

কারো দিকে না তাকিয়েই পণ্ডিতমশাই হঠাৎ ভরা মেঘের ডাক ছেড়ে বললেন, 'ওরে ও শাখামৃগ!'

নীল যাহার কন্ঠ তিনি নীলকন্ঠ—যোগরূঢ়ার্থে শিব। শাখাতে যে মৃগ বিচরণ করে সে শাখামৃগ, অর্থাৎ বাঁদর-ক্লাসরূঢ়ার্থে আমি। উত্তর দিলুম, 'আজ্ঞে।'

পণ্ডিতমশাই শুধালেন, 'লাট সায়েবের সঙ্গে কে কে এসেছিল বল তো রে।'

আমি সম্পূর্ণ ফিরিস্তি দিলুম। চাপরাশী নিত্যানন্দকেও বাদ দিলুম না।

বললেন, 'হলো না। আর কে ছিল?' বললুম 'ঐ যে বললুম, এক গাদা এডিসি না প্রাইভেট সেক্রেটারি না আর কিছু সঙ্গে ছিলেন। তাঁরা তো ক্লাসে ঢোকেননি'।

পণ্ডিতমশাই ভরা মেঘের গুরু গুরু ডাক আরো গম্ভীর করে শুধালেন, 'এক কথা বাহান্ন বার বলছিস কেন রে মূঢ়? আমি কালা না তোর মতো অলম্বুষ?'

আমি কাতর হয়ে বললুম, আর তো কেউ ছিল না পণ্ডিতমশাই, জিজ্ঞেস করুন না পদ্মলোচনকে, সে তো সবাইকে চেনে?'

পণ্ডিতমশাই হঠাৎ চোখ মেরে আমার দিকে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বললেন, 'ওঃ, উনি আবার লেখক হবেন। চোখে দেখতে পাসনে, কানা, দিবান্ধ-রাত্র্যন্ধ হলেও না হয় বুঝতুম। কেন? লাট সায়েবের কুকুরটাকে দেখতে পাসনি? এই পর্যবেক্ষণ শক্তি নিয়ে—

আমি তাড়াতাড়ি বললুম, 'হাঁ, হাঁ, দেখেছি। ও তো এক সেকেন্ডের তরে ক্লাসে ঢুকেছিল।'

পণ্ডিতমশাই বললেন, 'মর্কট এবং সারমেয় কদাচ এক গৃহে অবস্থান করে না। সে কথা যাক। কুকুরটার কি বৈশিষ্ট্য ছিল বল তো?'

ভাগ্যিস মনে পড়ল। বললুম, আজ্ঞে, একটা ঠ্যাং কম ছিল বলে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছিল।'

'হুঁ' বলে পণ্ডিতমশাই আবার চোখ বন্ধ করলেন।

অনেকক্ষণ পর বললেন, 'শোন। শুক্রবার দিন ছুটির পর কাজ ছিল বলে অনেক দেরিতে ঘাটে গিয়ে দেখি আমার নৌকার মাঝি এক অপরিচিতের সঙ্গে আলাপ করছে। লোকটা মুসলমান, মাথায় কিস্তিটুপী। আমাকে অনেক সেলাম টেলাম করে পরিচয় দিল, সে আমাদের গ্রামের মিম্বর উল্লার শালা; লাট সায়েবের আরদালি, সায়েবের সঙ্গে এখানে এসেছে, আজকের দিনটা ছুটি নিয়েছে তার দিদিকে দেখতে যাবে বলে। গাটে আর নৌকা নেই। আমি যদি মেহেরবানি করে একটু স্থান দিই।'

পণ্ডিতমশায়ের বাড়ি নদীর ওপারে, বেশ খানিকটা উজিয়ে। তাই তিনি বর্ষাকালে নৌকোয় যাতায়াত করতেন আর সকলকে অকাতরে লিফট দিতেন।

পণ্ডিতমশায় বললেন, 'লোকটার সঙ্গে কতাবার্তা হলো। লাট সায়েবের সব খবর জানে, তোর মতো কানা নয়, সব জিনিস দেখে, সব কথা মনে রাখে। লাট সায়েবের কুকুরটার একটা ঠ্যাং কি করে ট্রেনের চাকায় কাটা যায় সে খবরটাও বেশ গুছিয়ে বলল।'

তারপর পণ্ডিতমশাই ফের অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর আপন মনে আস্তে আস্তে বললেন, 'আমি, ব্রাহ্মণী, বৃদ্ধা মাতা, তিন কন্যা, বিধবা পিসি, দাসী একুনে আমরা আটজনা।'

তারপর হঠাৎ কথা ঘুরিয়ে ফেলে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'মদনমোহন কি রকম আঁক শেখায় রে?'

মদনমোহনবাবু আমাদের অঙ্কের মাস্টার—পণ্ডিতমশায়ের ছাত্র। বললুম, 'ভালই পড়ান।'

পণ্ডিতমশাই বললেন, 'বেশ বেশ! তবে শোন। মিম্বর উল্লার শালা বলল, লাট সায়েবের কুত্তাটার পিছনে মাসে পঁচাত্তর টাকা খরচা হয়। এইবার দেখি, কি রকম আঁক শিখেছিস। বলতো দেখি, যদি একটা কুকুরের পেছনে মাসে পঁচাত্তর টাকা খরচ হয়, আর সে কুকুরের তিনটে ঠ্যাং হয় তবে ফি ঠ্যাঙের জন্য কত খরচ হয়?'

আমি ভয় করছিলুম পণ্ডিতমশাই একটা মারাত্মক রকমের আঁক কষতে দেবেন। আরাম বোধ করে তাড়াতাড়ি বললুম, 'আজ্ঞে, পঁচিশ টাকা।' পণ্ডিতমশাই বললেন, 'সাধু, সাধু!'

তারপর বললেন, 'উত্তম প্রস্তাব। অপিচ আমি, ব্রাহ্মণী, বৃদ্ধা মাতা, তিন কন্যা, বিধবা পিসি, দাসী একুনে আটজন। আমাদের সকলের জীবন ধারণের জন্য আমি মাসে পাই পঁচিশ টাকা। এখন বল তো দেখি, তবে বুজি তোর পেটে কত বিদ্যে, এই ব্রাহ্মণ পরিবার লাট সায়েবের কুকুরের ক'টা ঠ্যাঙের সমান?'

আমি হতবাক।

'বল না।'

আমি মাথা নীচু করে বসে রইলুম। শুধু আমি না, সমস্ত ক্লাস নিস্তব্ধ।

পণ্ডিতমশাই হুঙ্কার দিয়ে বললেন, 'উত্তর দে।'

মূর্খের মতো একবার পণ্ডিতমশায়ের মুখের দিকে মিটমিটিয়ে তাকিয়েছিলুম। দেখি, সে মুখ লজ্জা, তিক্ততা, ঘৃণায় বিকৃত হয়ে গিয়েছে।

ক্লাসের সব ছেলে বুঝতে পেরেছে—কেউ বাদ যায়নি—পণ্ডিতমশাই আত্ম অবমাননার কি নির্ম্মম পরিহাস সর্বাঙ্গে মাখছেন, আমাদের সাক্ষী রেখে।

পণ্ডিতমশাই যেন উত্তরের প্রতীক্ষায় বসেই আছেন। সেই জগদ্দল নিস্তব্ধতা ভেঙে কতক্ষণ পরে ক্লাস শেষের ঘণ্টা বেজেছিল আমার হিসেব নেই।

এই নিস্তব্ধতার নিপীড়নস্মৃতি আমার মন থেকে কখনো মুছে যাবে না।

'নিস্তব্ধতা হিরণ্ময়' 'Silence is golden' যে মূর্খ বলেছে তাকে যেন মরার পূর্বে একবার একলা-একলি পাই।

শিউলিমালা

– কাজী নজরুল ইসলাম

মিস্টার আজহার কলকাতার নাম-করা তরুণ ব্যারিস্টার।

বাটলার, খানসামা, বয়, দারোয়ান, মালি, চাকর-চাকরানিতে বাড়ি তার হরদম সরগরম।

কিন্তু বাড়ির আসল শোভাই নাই। মিস্টার আজহার অবিবাহিত।

নাম-করা ব্যারিস্টার হলেও আজহার সহজে বেশি কেস নিতে চায় না। হাজার পীড়াপীড়িতেও না। লোকে বলে, পসার জমাবার এও একরকম চাল।

কিন্তু কলকাতার দাবাড়েরা জানে যে, মিস্টার আজহারের চাল যদি থাকে – তা সে দাবার চাল।

দাবা-খেলায় তাকে আজও কেউ হারাতে পারেনি। তার দাবার আড্ডার বন্ধুরা জানে, এই দাবাতে মিস্টার আজহারকে বড়ো ব্যারিস্টার হতে দেয়নি, কিন্তু বড়ো মানুষ করে রেখেছে।

বড়ো ব্যারিস্টার যখন 'উইকলি নোটস' পড়েন আজহার তখন অ্যালেখিন, ক্যাপাব্লাঙ্কা কিংবা রুবিনস্টাইন, রেটি, মরফির খেলা নিয়ে ভাবে, কিংবা চেস-ম্যাগাজিন নিয়ে পড়ে, আর চোখ বুজে তাদের চালের কথা ভাবে।

সকালে তার হয় না, বিকেলের দিকে রোজ দাবার আড্ডা বসে। কলকাতার অধিকাংশ বিখ্যাত দাবাড়েই সেখানে এসে আড্ডা দেয়, খেলে, খেলা নিয়ে আলোচনা করে।

আজহারের সবচেয়ে দুঃখ, ক্যাপাব্লাঙ্কার মতো খেলোয়াড় কিনা অ্যালেখিনের কাছে হেরে গেল। অথচ অ্যালেখিনই বোগোল-জুবোর মতো খেলোয়াড়ের কাছে অন্তত পাঁচ পাঁচবার হেরে যায়!

মিস্টার মুখার্জি অ্যালেখিনের একরোখা ভক্ত। আজও মিস্টার আজহার নিত্যকার মতো একবার ওই কথা নিয়ে দুঃখ প্রকাশ করলে, মিস্টার মুখার্জি বলে উঠল – 'কিন্তু তুমি যাই বল আজহার, অ্যালেখিনের ডিফেন্স – ওর বুঝি জগতে তুলনা নেই। আর বোগোল-জুবো? ও যে অ্যালেখিনের কাছ তিন-পাঁচে পনেরোবার হেরে ভূত হয়ে গেছে! ওয়ার্লড-চ্যাম্পিয়ানশিপের খেলায় অমন দু চার বাজি সমস্ত ওয়ার্লড-চ্যাম্পিয়ানই হেরে থাকেন। চব্বিশ দান খেলায় পাঁচ দান জিতেছে। তা ছাড়া, বোগোল-জুবোও তো যে সে খেলোয়াড় নয়!'

আজহার হেসে বলে উঠল, 'আরে রাখো তোমার অ্যালেখিন। এইবার ক্যাপাব্লাঙ্কার সাথে আবার খেলা হচ্ছে তার, তখন দেখো একবার অ্যালেখিনের দুর্দশা! আর বোগোল-জুবোকে তো সেদিনও ইটালিয়ান মন্টেসেলি বগলা-দাবা করে নিলে! হাঁ, খেলে বটে গ্রানফেল্‌ড।'

বন্ধুদের মধ্যে একজন চটে গিয়ে বললে, 'তোমাদের কি ছাই আর কোনো কম্ম নেই? কোথাকার বগলঝুপো না ছাইমুণ্ডু, অ্যালেখিন না ঘোড়ার ডিম – জ্বালালে বাবা।'

মুখার্জি হেসে বলল, 'তুমি তো বেশ গ্রাবু খেলতে পার অজিত, এমন মাহ ভাদর, চলে যাওনা স্ত্রীর বোনেদের বাড়িতে! এ দাবার চাল তোমার মাথায় ঢুকবে না!'

তরুণ উকিল নাজিম হাই তুলে তুড়ি দিয়ে বলে উঠলে, 'ও জিনিস মাথায় না ঢোকাতে বেঁচে গেছি বাবা! তার চেয়ে আজহার সাহেব দুটো গান শোনান, আমরা শুনে যে যার ঘরে চলে যাই। তার পর তোমরা রাজা মন্ত্রী নিয়ে বোসো।'

দাবাড়ে দলের আপত্তি টিকল না। আজহারকে গাইতে হল। আজহার চমৎকার ঠুংরি গায়। বিশুদ্ধ লখনউ ঢং-এর ঠুংরি গান তার জানা ছিল। এবং তা এমন দরদ দিয়ে গাইত সে, যে শুনত সেই মুগ্ধ হয়ে যেত। আজ কিন্তু সে কেবলই গজল গাইতে লাগল।

আজহার অন্য সময় সহজে গজল গাইতে চাইত না।

মুখার্জি হেসে বলে উঠল,– ‘আজ তোমার প্রাণে বিরহ উথলে উঠল নাকি হে? কেবলই গজল গাচ্ছ, মানে কী? রংটং ধরেছে নাকি কোথাও!’

আজহারও হেসে বলল, ‘বাইরের দিকে একবার তাকিয়ে দেখো।’

এতক্ষণে যেন সকলের বাইরের দিকে নজর পড়ল। একটু আগের বর্ষা-ধোয়া ছলছলে আকাশ। যেন একটি বিরাট নীল পদ্ম। তারই মাঝে শরতের চাঁদ যেন পদ্মমণি। চারপাশে তারা যেন আলোক-ভ্রমর।

লেক-রোডের পাশে ছবির মতো বাড়িটি।

শিউলির সাথে রজনিগন্ধার গন্ধ-মেশা হাওয়া মাঝে মাঝে হলঘরটাকে উদাস-মদির করে তুলছিল!

সকলের আর এক প্রস্থ চা খাওয়া হলে পর সিগার ধরিয়ে মিনিটখানিক ধূম্র উদ্‌গীরণ করে আজহার বলতে লাগল–

তখন সবেমাত্র ব্যারিস্টারি পাশ করে এসেই শিলং বেড়াতে গেছি। ভাদ্র মাস। তখনও পূজার ছুটিওয়ালার দল এসে ভিড় জমায়নি। তবে আগে থেকেই দু-একজন করে আসতে শুরু করেছেন। ছেলেবেলা থেকেই আমার দাবাখেলার ওপর বড্ডো বেশি ঝোঁক ছিল। ও ঝোঁক বিলেতে গিয়ে আরও বেশি করে চাপল। সেখানে ইয়েটস্, মিচেল, উইন্টার, টমাস প্রভৃতি সকল নাম-করা খেলোয়াড়ের সঙ্গে খেলেছি এবং কেম্ব্রিজের হয়ে অনেকগুলো খেলা জিতেওছি। শিলং গিয়ে খুঁজতেই দু-একজন দাবা-খেলোয়াড়ের সঙ্গে পরিচয়ও হয়ে গেল। তবে তারা কেউ বড়ো খেলোয়াড় নয়। তারা আমার কাছে ক্রমাগত হারত। একদিন ওরই মধ্যে একজন বলে উঠল, ‘একজন বুড়ো রিটায়ার্ড প্রফেসর আছেন এখানে, তিনি মস্ত বড়ো দাবাড়ে, শোনা যায় – তাঁকে কেউ হারাতে পারে না – যাবেন খেলতে তাঁর সাথে?’

আমি তখনই উঠে পড়ে বললাম, ‘এখনই যাব, চলুন কোথায় তিনি?’

সে ভদ্রলোকটি বললেন, ‘চলুন না, নিয়ে যাচ্ছি! আপনার মতো খেলোয়াড় পেলে তিনি বড়ো খুশি হবেন। তাঁরও আপনার মতোই দাবা-খেলার নেশা। অদ্ভুত খেলোয়াড় বুড়ো, চোখ বেঁধে খেলে মশাই!’

আমি ইউরোপে অনেকেরই ‘ব্লাইন্ড ফোল্ডেড’ খেলা দেখেছি, নিজেও অনেকবার খেলেছি। কাজেই এতে বিশেষ বিস্মিত হলাম না।

তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। আকাশে এক ফালি চাঁদ, বোধ হয় শুক্লাপঞ্চমীর। যেন নতুন আশার ইঙ্গিত। সারা আকাশে যেন সাদা মেঘের তরণির বাইচ খেলা শুরু হয়েছে। চাঁদ আর তারা তার মাঝে যেন হাবুডুবু খেয়ে একবার ভাসছে একবার উঠছে।

ইউক্যালিপটাস আর দেবদারু তরুঘেরা একটি রঙিন বাংলোয় গিয়ে আমরা উঠতেই দেখি, প্রায় ষাটের কাছাকাছি বয়েস এক শান্ত সৌম্যমূর্তি বৃদ্ধ ভদ্রলোক একটি তরুণীর সঙ্গে দাবা খেলছেন।

আমাদের দেশের মেয়েরাও দাবা খেলেন, এই প্রথম দেখলাম।

বিস্ময়-শ্রদ্ধা-ভরা দৃষ্টি দিয়ে তরুণীর দিকে তাকাতেই তরুণীটি উঠে পড়ে বললে, ‘বাবা, দ্যাখো কারা এসেছেন!’

খেলাটা শেষ না হতেই মেয়ে উঠে পড়েতে বৃদ্ধ ভদ্রলোক যেন একটু বিরক্ত হয়েই আমাদের দিকে তাকিয়ে পরক্ষণেই হাসিমুখে উঠে বললেন ‘আরে, বিনয়বাবু যে! এঁরা, কারা? এসো, বোসো। এঁদের পরিচয় —’

বিনয়বাবু – যিনি আমার নিয়ে গেছিলেন, আমার পরিচয় দিতেই বৃদ্ধ লাফিয়ে উঠে আমায় একেবারে বুকে জড়িয়ে ধরে বলে উঠলেন, ‘আপনি – এই তুমিই আজহার? আরে, তোমার নাম যে চেস-ম্যাগাজিনে, কাগজে অনেক দেখেছি। তুমি যে মস্ত বড়ো খেলোয়াড়! ইয়েটসের সঙ্গে বাজি

চটিয়েছ, একী কম কথা! এই তো তোমার বয়েস! – বড়ো খুশি হলুম – বড়ো খুশি হলুম।... ওমা শিউলি, একজন মস্ত দাবাড়ে এসেছে! দেখে যাও! বাঃ, বড়ো আনন্দে কাটবে তাহলে। এই বুড়োবয়সেও আমার বড্ডো দাবা-খেলার ঝোঁক, কী করি, কাউকে না পেয়ে মেয়ের সাথেই খেলছিলুম!' বলেই হো হো করে প্রাণখোলা হাসি হেসে শান্ত সন্ধ্যাকে মুখরিত করে তুললেন।

শিউলি নমস্কার করে নীরবে তার বাবার পাশে এসে বসল। তাকে দেখে আমার মনে হল এ যেন সত্যই শরতের শিউলি।

গায়ে গোধূলি রং-এর শাড়ির মাঝে নিষ্কলঙ্ক শুভ্র মুখখানি – হলুদ রং বোঁটায় শুভ্র শিউলিফুলের মতোই সুন্দর দেখাচ্ছিল। আমার চেয়ে থাকার মাত্রা হয়তো একটু বেশিই হয়ে পড়েছিল। বৃদ্ধের উক্তিতে আমার চমক ভাঙল।

বৃদ্ধ যেন খেলার জন্য অসহিষ্ণু হয়ে পড়ছিলেন। চাকর চায়ের সরঞ্জাম এনে দিতেই শিউলি চা তৈরি করতে করতে হেসে বলে উঠল, 'বাবার বুঝি আর দেরি সইছে না?' বলেই আমার দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, 'কিছু মনে করবেন না! বাবা বড্ড দাবা খেলতে ভালোবাসেন! দাবা খেলতে না পেলেই ওঁর অসুখ হয়!' বলেই চায়ের কাপ এগিয়ে দিয়ে বলল, 'এইবার চা খেতে খেতে খেলা আরম্ভ করুন, আমরা দেখি!'

বিনয় হেসে বলল, 'হাঁ, এইবার সমানে সমানে লড়াই। বুঝলে মা মিস চৌধুরি, আমাদের রোজ উনি হারিয়ে ভূত করে দেন।'

খেলা আরম্ভ হল। সকলে উৎসুক হয়ে দেখতে লাগল, কেউ কেউ উপরচালও দিতে লাগল। মিস চৌধুরি ওরফে শিউলি তার বাবার যা দু একটি ত্রুটি ধরিয়ে দিলে, তাতে বুঝলাম – এও এর বাবার মতোই ভালো খেলোয়াড়।

কিছুক্ষণ খেলার পর বুঝলাম, আমি ইউরোপে যাঁদের সঙ্গে খেলেছি– তাঁদের অনেকের চেয়েই বড়ো খেলোয়াড় প্রফেসর চৌধুরি॥ আমি প্রফেসর চৌধুরিকে জানতাম বড়ো কেমিস্ট বলে, কিন্তু তিনি যে এমন অদ্ভুত ভালো দাবা খেলতে পারেন, এ আমি জানতাম না।

আমি একটা বেশি বল কেটে নিতেই বৃদ্ধ আমার পিঠ চাপড়ে তারিফ করে ডিফেন্সিভ খেলা খেলতে লাগলেন। তিনি আমার গজের খেলার যথেষ্ট প্রশংসা করলেন। শিউলি বিস্ময় ও প্রশংসার দৃষ্টি দিয়ে বারেবারে আমার দিকে তাকাতে লাগল। কিন্তু একটা বল কম নিয়েও বৃদ্ধ এমন ভালো খেলতে লাগলেন যে, আমি পাছে হেরে যাই এই ভয়ে খেলাটা ড্র করে দিলাম। বৃদ্ধ বারংবার আমার প্রশংসা করতে করতে বললেন, 'দেখলি মা শিউলি, আমাদের খেলোয়াড়দের বিশ্বাস, গজ ঘোড়ার মতো খেলে না। দেখলি জোড়া গজে কী খেললে! বড়ো ভালো খেল বাবা তুমি! আমি হারি কিংবা হারাই, ড্র সহজে হয় না!'

শিউলি হেসে বললে, কিন্তু তুমি হারনি কত বছর বলো তো বাবা!'

প্রফেসর চৌধুরি হেসে বললেন, না মা, হেরেছি। সে আজ প্রায় পনেরো বছর হল, একজন পাড়াগাঁয়ে ভদ্রলোক – আধুনিক শিক্ষিত নন – আমায় হারিয়ে দিয়ে গেছিলেন। ওঃ, ওরকম খেলোয়াড় আর দেখিনি!'

আবার খেলা আরম্ভ হতেই বিনয় হেসে বলে উঠল, 'এইবার মিস চৌধুরি খেলুন না মিস্টার আজহারের সাথে!'

বৃদ্ধ খুশি হয়ে বললেন, 'বেশ তো! তুই-ই খেল মা, আমি একবার দেখি!'

শিউলি লজ্জিত হয়ে বলে উঠল, 'আমি কি ওঁর সঙ্গে খেলতে পারি?'

কিন্তু সকলের অনুরোধে সে খেলতে বসল। মাঝে চেসবোর্ড একধারে চেয়ারে শিউলি – একধারে আমি! তার কেশের গন্ধ আমার মস্তিষ্ককে মদির করে তুলছিল। আমার দেখে মনে যেন নেশা ধরে আসছিল। আমি দু-একটা ভুল চাল দিতেই শিউলি আমার দিকে তাকিয়ে চোখ নত করে ফেললে। মনে হল, তার ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা। সে হাসি যেন অর্থপূর্ণ।

আবার ভুল করতেই আমি চাপায় পড়ে আমার একটা নৌকা হারালাম। বৃদ্ধ যেন একটু বিস্মিত হলেন। বিনয়বাবুর দল হেসে বলে উঠলেন – 'এইবার মিস্টার আজহার মাত হবেন।' মনে হল, এ হাসিতে বিদ্রুপ লুকোনো আছে।

আমি এইবার সংযত হয়ে মন দিয়ে খেলতে লাগলাম। দুই গজ ও মন্ত্রী দিয়ে এবং নিজের কোটের বোড়ে এগিয়ে এমন অফেন্সিভ খেলা খেলতে শুরু করে দিলাম যে, প্রফেসার চৌধুরিও আর এ-খেলা বাঁচাতে পারলেন না। শিউলি হেরে গেল! সে হেরে গেলেও এত ভালো খেলেছিল যে, আমি তার প্রশংসা না করে থাকতে পারলাম না। আমি বললাম – 'দেখুন, মেয়েদের ওয়ার্লড-চ্যাম্পিয়ান মিস মেনচিকের সাথেও খেলেছি, কিন্তু এত বেশি বেগ পেতে হয়নি আমাকে, আমি তো প্রায় হেরেই গেছিলাম।'

দেখলাম আনন্দে লজ্জায় শিউলি কমলফুলের মতো রাঙা হয়ে উঠেছে! আমি বেঁচে গেলাম। সে যে হেরে গিয়ে আমার উপর ক্ষুব্ধ হয়নি – এই আমার যথেষ্ট সৌভাগ্য মনে করলাম।

প্রফেসার চৌধুরির সঙ্গে আবার খেলা হল, এবারও ড্র হয়ে গেল।

বৃদ্ধের আনন্দ দেখে কে! বললেন, 'হাঁ, এতদিন পরে একজন খেলোয়াড় পেলুম, যার সঙ্গে খেলতে হলে অন্তত আট চাল ভেবে খেলতে হয়!'

কথা হল, এরপর রোজ প্রফেসার চৌধুরির বাসায় দাবার আড্ডা বসবে।

উঠবার সময় হঠাৎ বৃদ্ধ বলে উঠলেন, 'মা শিউলি, এতক্ষণ খেলে মিস্টার আজহারের নিশ্চয়ই বড্ড কষ্ট হয়েছে, ওঁকে একটু গান শোনাও না!' আমি তৎক্ষণাৎ বসে পড়ে বললাম, 'বাঃ এ খবর তো জানতাম না।'

শিউলি কুন্ঠিতস্বরে বলে উঠল, 'এই শিখছি কিছুদিন থেকে, এখনও ভালো গাইতে জানিনে!'

শিউলির আপত্তি আমাদের প্রতিবাদে টিকল না। সে গান করতে লাগল।

সে গান যারই লেখা হোক – আমার মনে হতে লাগল – এর ভাষা যেন শিউলিরই প্রাণের ভাষা – তার বেদনা নিবেদন।

এক একজনের কন্ঠ আছে – যা শুনে এ কন্ঠ ভালো কি মন্দ বুঝবার ক্ষমতা লোপ করে দেয়! সে কন্ঠ এমন দরদে ভরা – এমন অকৃত্রিম যে, তা শ্রোতাকে প্রশংসা করতে ভুলিয়ে দেয়। ভালোমন্দ বিচারের বহু ঊর্ধ্বে সে কন্ঠ, কোনো কর্তব নেই, সুর নিয়ে কোনো কৃচ্ছ্রসাধনা নেই, অথচ হৃদয়কে স্পর্শ করে। এর প্রশংসাবাণী উথলে উঠে মুখে নয় – চোখে!

এ সেই কন্ঠ! মুগ্ধ হয়ে গেলাম। কিছু বলবার ইচ্ছা ছিল না। ভদ্রতার খাতিরে একবার মাত্র বলতে গেলাম, 'অপূর্ব!' গলার স্বর বেরুল না। শিউলির চোখে পড়ল – আমার চোখের জল। সে তার দীর্ঘায়ত চোখের পরিপূর্ণ বিস্ময় নিয়ে যেন সেই জলের অর্থ খুঁজতে লাগল।

হায়, সে যদি জানত – কালির লেখা মুছে যায়, জলের লেখা মোছে না!

সেদিন আমায় নিয়ে কে কী ভেবেছিল – তা নিয়ে সেদিনও ভাবিনি, আজও ভাবি না। ভাবি – শিউলিফুল যদি গান গাইতে পারত, সে বুঝি এমনি করেই গান গাইত। গলায় তার দরদ, সুরে তার এমনি আবেগ!

সুরের যেটুকু কাজ সে দেখাল, তা ঠুংরি ও টপ্পা মেশানো। কিন্তু বুঝলাম, এ তার ঠিক শেখা নয় – গলার ও-কাজটুকু স্বতঃস্ফূর্ত! কমল যেমন না জেনেই তার গন্ধ-পরাগ ঘিরে শতদলের সুচারু সমাবেশ করে – এও যেন তেমনই।

গানের শেষে বলে উঠলাম, 'আপনি যদি ঠুংরি শেখেন, আপনি দেশের অপ্রতিদ্বন্দ্বী সুর-শিল্পী হতে পারেন! কী অপূর্ব সুরেলা কন্ঠস্বর।'

শিউলিফুলের শাখায় চাঁদের আলো পড়লে তা যেমন শোভা ধারণ করে, আনন্দ ও লজ্জা মিশে শিউলিকে তেমনই সুন্দর দেখাচ্ছিল।

শিউলি তার লজ্জাকে অতিক্রম করে বলে উঠল, ‘না, না, আমার গলা একটু ভাঙা। সে যাক, আমার মনে হচ্ছে আপনি গান জানেন। জানেন যদি, গান না একটা গান।’

আমি একটু মুশকিলে পড়লাম! ভাবলাম, ‘না বলি। আবার গান শুনে গলাটাও গাইবার জন্য সুড়সুড় করছে! বললাম, ‘আমি ঠিক গাইয়ে নই, সমঝদার মাত্র! আর যা গান জানি, তাও হিন্দি।’

প্রফেসার চৌধুরি খুশি হয়ে বলে উঠলেন, ‘আহা হা হা। বলতে হয় আগে থেকে। তাহলে যে গানটাই আগে শুনতাম তোমার। আর গান হিন্দি ভাষায় না হলে জমেই না ছাই। ও ভাষাটাই যেন গানের ভাষা। দেখো, ক্লাসিকাল মিউজিকের ভাষা বাংলা হতেই পারে না। কীর্তন বাউল আর রামপ্রসাদি ছাড়া এ ভাষায় অন্য ঢং-এর গান চলে না।’ আমি বললাম, ‘আমি যদিও বাংলা গান জানিনে, তবু বাংলা ভাষা সম্বন্ধে এতটা নিরাশাও পোষণ করি না।’

গান করলাম। প্রফেসার চৌধুরি তো ধরে বসলেন, তাঁকে গান শেখাতে হবে কাল থেকে। শিউলির দুই চোখে প্রশংসার দীপ্তি ঝলমল করছিল।

বিনয়বাবুর দলও ওস্তাদি গানেরই পক্ষপাতী দেখলাম। তাদের অনুরোধে দু চারখানা খেয়াল ও টপ্পা গাইলাম। প্রফেসর চৌধুরির সাধুবাদের আতিশয্যে আমার গানের অর্ধেক শোনাই গেল না। শেষের দিকে ঠুংরিই গাইলাম বেশি।

গানের শেষে দেখি আমাদের পিছন দিকে আরও কয়েকজন মহিলা এসে দাঁড়িয়েছেন। শিউলি পরিচয় করিয়ে দিল – ‘ইনি আমার মা– ইনি আমার মামিমা – এরা আমার ছোটো বোন।’

তার পরের দিন দুপুরে প্রফেসর চৌধুরির বাড়িতে নিমন্ত্রিত হলাম। ফিরবার সময় নমস্কারান্তে চোখে পড়ল শিউলির চোখ। চোখ জ্বালা করে উঠল। মনে হল, চোখে এক কণা বালি পড়লেই যদি চোখ এত জ্বালা করে – চোখে যার চোখ পড়ে তার যন্ত্রণা বুঝি অনুভূতির বাইরে!

৩

দেড় মাস ছিলাম শিলং-এ। হপ্তাখানেকের পরেই আমাকে হোটেল ছেড়ে প্রফেসর চৌধুরির বাড়ি থাকতে হয়েছিল গিয়ে। সেখানে আমার দিন-রাত্রি নদীর জলের মতো বয়ে যেতে লাগল। কাজের মধ্যে দাবা খেলা আর গান।

মুশকিলে পড়লাম – প্রফেসার চৌধুরিকে নিয়ে। তাঁর সঙ্গে দাবাখেলা তো আছেই – তাঁকে গান শেখানোই হয়ে উঠল আমার পক্ষে সব চেয়ে দুষ্কর কার্য।

শিউলিও আমার কাছে গান শিখতে লাগল। কিছুদিন পরেই আমার গান ও গানের পুঁজি প্রায় শেষ হয়ে গেল।

মনে হল আমার গান শেখা সার্থক হয়ে গেল। আমার কন্ঠের সকল সঞ্চয় রিক্ত করে তার কন্ঠে ঢেলে দিলাম।

আমাদের মালা বিনিময় হল না– হবেও না এ জীবনে কোনোদিন – কিন্তু কন্ঠ বদল হয়ে গেল! আর মনের কথা – সে শুধু মনই জানে!

অজিত বাধা দিয়ে বলে উঠল, ‘কন্ঠ না কন্ঠী বদল বাবা? শেষটা নেড়ানেড়ির প্রেম! ছোঃ!’

আজহার কিছু না বলে আবার সিগার ধরিয়ে বলে যেতে লাগল–

একদিন ভোরে শিউলির কন্ঠে ঘুম ভেঙে গেল। সে গাচ্ছিল–

'এখন আমার সময় হল

যাবার দুয়ার খোলো খোলো।'

গান শুনতে শুনতে মনে হল – আমার বুকের সকল পাঁজর জুড়ে ব্যথা। চেষ্টা করেও উঠতে পারলাম না। চোখে জল ভরে এল।

আশাবরি সুরের কোমল গান্ধারে আর ধৈবতে যেন তার হৃদয়ের সমস্ত বেদনা গড়িয়ে পড়ছিল! আজ প্রথম শিউলির কন্ঠস্বরে অশ্রুর আভাস পেলাম।

ঠুং করে কীসের শব্দ হতেই ফিরে দেখি, শিউলি তার দুটি করপল্লব ভরে শিউলি ফুলের অঞ্জলি নিয়ে পূজারিনির মতো আমার টেবিলের উপর রাখছে। চোখে তার জল।

আমার চোখে চোখ পড়তেই সে তার অশ্রু লুকাবার কোনো ছলনা না করে জিজ্ঞাসা করল – আপনি কি কালই যাচ্ছেন?

উত্তর দিতে গিয়ে কান্নায় আমার কন্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল। পরিপূর্ণ শক্তি দিয়ে হৃদয়াবেগ সংযত করে আস্তে বললাম – 'হাঁ ভাই!' আরও যেন কী বলতে চাইলাম। কিন্তু কী বলতে চাই ভুলে গেলাম।

শিউলি শিউলি ফুলগুলিকে মুঠোয় তুলে অন্যমনস্কভাবে অধরে কপোলে ছুঁইয়ে বলল, 'আবার কবে আসবেন।'

আমি ম্লান হাসি হেসে বললাম, 'তাও জানিনে ভাই! হয়তো আসব!'

শিউলি ফুলগুলি রেখে চলে গেল। আর একটি কথাও জিজ্ঞেস করল না।

আমার সমস্ত মন যেন আর্তস্বরে কেঁদে উঠল – ওরে মূঢ়, জীবনের মাহেন্দ্রক্ষণ তোর এই এক মুহূর্তের জন্যই এসেছিল, তুই তা হেলায় হারালি! জীবনে তোর দ্বিতীয়বার এ শুভ মুহূর্ত আর আসবে না, আসবে না।

এক মাস ওদের বাড়িতে ছিলাম। কত স্নেহ কত যত্ন, কত আদর। অবাধ মেলামেশা – সেখানে কোনো নিষেধ, কোনো গ্লানি, কোনো বাধাবিঘ্ন কোনো সন্দেহ ছিল না। আর এ সব ছিল না বলেই বুঝি এতদিন ধরে এত কাছে থেকেও কারুর করে কর-স্পর্শটুকুও লাগেনি কোনোদিন। এই মুক্তিই ছিল বুঝি আমাদের সবচেয়ে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা। কেউ কারুর মন যাচাই করিনি। কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসার কথাও উদয় হয়নি মনে। একজন অসীম আকাশ – একজন অতল সাগর। কোনো কথা নেই – প্রশ্ন নেই, শুধু এ ওর চোখে চোখ রেখে তাকিয়ে আছে।

কেউ নিষেধ করলে না, কেউ এসে পথ আগলে দাঁড়াল না! সেও যেন জানে – আমাকে চলে আসতেই হবে, আমিও যেন জানি – আমাকে যেতেই হবে।

নদীর স্রোতই যেন সত্য – অসহায় দুই কূল এ ওর পানে তাকিয়ে আছে। অভিলাষ নাই – আছে শুধু অসহায় অশ্রু-চোখে চেয়ে থাকা।

সে চলে গেল টেবিলের শিউলিফুলের অঞ্জলি দুই হাতে তুলে মুখে ঠেকাতে গেলাম। বুঝি বা আমারও অজানিতে আমি সে ফুল ললাটে ঠেকিয়ে আবার টেবিলে রাখলাম। মনে হল, এ ফুল পূজারিনির – প্রিয়ার নয়। ভাবতেই বুক যেন অব্যক্ত বেদনায় ভেঙে যেতে লাগল।

চোখ তুলেই দেখি, নিত্যকার মতোই হাসিমুখে দাঁড়িয়ে শিউলি বলছে – 'আজ আমায় গান শেখাবেন না?'

আমি বললাম – 'চলো, আজই তো শেষ নয়।'

শিউলি তার হরিণ-চোখ তুলে আমার পানে চেয়ে রইল। ভয় হল বলে তার মানে বুঝবার চেষ্টা করলাম না।

ও যেন স্পর্শাতুর কামিনী ফুল, আমি যেন ভীরু ভোরের হাওয়া – যত ভালোবাসা, তত ভয়! ও বুঝি ছুঁলেই ধুলায় ঝরে পড়বে।

এ যেন পরির দেশের স্বপ্নমায়া, চোখ চাইলেই স্বপ্ন টুটে যাবে!

এ যেন মায়া-মৃগ – ধরতে গেলেই হাওয়ায় মিশিয়ে যাবে!

গান শেখালাম – বিদায়ের গান নয়। বিদায়ের ছাড়া আর সব কিছুর গান। বিদায় বেলা তো আসবেই – তবে আর কথা বলে ওর সব বেদনা সব মাধুর্যটুকু নষ্ট করি কেন?

সেদিনকার সন্ধ্যা ছিল নিষ্কলঙ্ক – নির্মেঘ – নিরাভরণ। আমি প্রফেসর চৌধুরিকে বললাম – আজকের সন্ধ্যাটা আশ্চর্য ভালোমানুষ সেজেছে তো! কোনো বেশভূষা নাই।

বলতেই মুখের কথা কেড়ে নিয়ে প্রফেসর চৌধুরি বলে উঠলেন – 'সন্ধ্যা আজ বিধবা হয়েছে!'

এই একটি কথায় ওঁর মনের কথা বুঝতে পারলাম। এই শান্ত সৌম্য মানুষটির বুকেও কী ঝড় উঠেছে বুঝলাম। মনে মনে বললাম – তুমি অটল পাহাড়, তোমার পায়ের তলায় বসে শুধু ধ্যান করতে হয়! তোমাকে তো ঝড় স্পর্শ করতে পারে না!

বৃদ্ধ বুঝি মন দিয়ে আমার মনের কথা শুনেছিলেন। ম্লান হাসি হেসে বললেন – 'আমি অতি ক্ষুদ্র, বাবা! পাহাড় নয়, বল্মীকস্তূপ! তবু তোমাদের শ্রদ্ধা দেখে গিরিরাজ হতেই ইচ্ছা করে!

আমি কিছু উত্তর দেবার আগেই শিউলি আমাদের সামনে এসে দাঁড়াল। হঠাৎ আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল – 'এই যে সন্ধ্যা দেবী!' বলেই লজ্জিত হয়ে পড়লাম।

শিউলির সোনার তনু ঘিরে ছিল সেদিন টকটকে লাল রং-এর শাড়ি। ওকে লাল শাড়ি পরতে আর কোনোদিন দেখিনি। মনে হল, সারা আকাশকে বঞ্চিত করে সন্ধ্যা আজ মূর্তি ধরে পৃথিবীতে নেমে এসেছে। তার দেহে রক্ত-ধারা রং-এর শাড়ি, তার মনে রক্ত-ধারা, মুখে অনাগত নিশীথের ম্লান ছায়া! চোখ যেমন পুড়িয়ে গেল, তেমনই পুরবির বাঁশি বেজে উঠল।

শিউলির কাছে দু-একটা বাংলা গান শিখেছিলাম। আমি বললাম – 'একটা গান গাইব?' শিউলি আমার পায়ের কাছে ঘাসের উপর বসে পড়ে বলল – 'গান!'

আমি গাইলাম-

'বিবাহের রঙে রাঙা হয়ে এল

সোনার গগন রে?'

প্রফেসর চৌধুরি উঠে গেলেন। যাবার সময় বলে গেলেন, 'বাবাজি, আজ একবার শেষ বার দাবা খেলতে হবে!'

চৌধুরি সাহেব উঠে যেতে আমি বললাম – ‘আচ্ছা ভাই শিউলি আবার যখন এমনই আশ্বিন মাস – এমনই সন্ধ্যা আসবে – তখন কী করব, বলতে পারো?’

শিউলি তার দু-চোখ ভরা কথা নিয়ে আমার চোখের উপর যেন উজার করে দিল। তার পর ধীরে ধীরে বলল, – ‘শিউলিফুলের মালা নিয়ে জলে ভাসিয়ে দিয়ো!’

আমি নীরবে সায় দিলাম – তাই হবে! জিজ্ঞাসা করলাম – ‘তুমি কী করবে!’ সে হেসে বললে, ‘আশ্বিনের শেষে তো শিউলি ঝরেই পড়ে!’

আমাদের চোখের জল লেগে সন্ধ্যাতারা চিকচিক করে উঠল।

রাত্রে দাবা-খেলার আড্ডা বসল! প্রফেসর চৌধুরি আমার কাছে হেরে গেলেন। আমি শিউলির কাছে হেরে গেলাম! জীবনে আমার সেই প্রথম এবং শেষ হার! আর সেই হারই আমার গলার হার হয়ে রইল!

সকালে যখন বিদায় নিলাম – তখন তাদের বাংলোর চারপাশে উইলো-তরু তুষারে ঢাকা পড়েছে!

আর তার সাথে দেখা হয়নি– হবেও না! একটু হাত বাড়ালে হয়তো তাকে ছুঁতে পারি, এত কাছে থাকে সে । তবু ছুঁতে সাহস হয় না। শিউলিফুল – বড়ো মৃদু, বড়ো ভীরু, গলায় পরলে দু-দণ্ডে আঁউরে যায়! তাই শিউলিফুলের আশ্বিন যখন আসে – তখন নীরবে মালা গাঁথি আর জলে ভাসিয়ে দিই!

বলাকা

Poem by Rabindranath Tagore

সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা

আঁধারে মলিন হলো যেন খাপে ঢাকা

বাঁকা তলোয়ার !

দিনের ভাঁটার শেষে রাত্রির জোয়ার

এলো তার ভেসে-আসা তারাফুল নিয়ে কালো জলে ;

অন্ধকার গিরিতটতলে

দেওদার-তরু সারে সারে ;

মনে হলো , সৃষ্টি যেন স্বপ্নে চায় কথা কহিবারে ,

বলিতে না পরে স্পষ্ট করি

অব্যক্ত ধ্বনির পুঞ্জ অন্ধকারে উঠিছে গুমরি ।।

সহসা শুনিনু সেই ক্ষণে

সন্ধ্যার গগনে

শব্দের বিদ্যুৎছটা শূন্যের প্রান্তরে

মুহূর্তে ছুটিয়া গেল দূর হতে দূরে দূরান্তরে।

হে হংসবলাকা,

ঝঞ্ঝামদরসে-মত্ত তোমাদের পাখা

রাশি রাশি আনন্দের অট্টহাসে

বিস্ময়ের জাগরণ তরঙ্গিয়া চলিল আকাশে।

ওই পক্ষধ্বনি,

শব্দময়ী অপ্সররমণী ,

গেলো চলি স্তব্ধতার তপোভঙ্গ করি।

উঠিল শিহরি

গিরিশ্রেণী তিমিরমগন ,

শিহরিল দেওদার-বন ।।

মনে হল এ পাখার বাণী

দিল আনি

শুধু পুলকের তরে

পুলকিত নিশ্চলের অন্তরে অন্তরে

বেগের আবেগ।

পর্বত চাহিল হতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ ;

তরুশ্রেণী চাহে পাখা মেলি

মাটির বন্ধন ফেলি

ওই শব্দ রেখা ধ'রে চকিতে হইতে দিশাহারা,

আকাশের খুঁজিতে কিনারা।

এ সন্ধ্যার স্বপ্ন টুটে বেদনার ঢেউ উঠে জাগি

সুদূরের লাগি ,

হে পাখা বিবাগি !

বাজিল ব্যাকুল বাণী নিখিলের প্রাণে -

'হেথা নয় , হেথা নয়, আর কোনখানে !

হে হংসবলাকা ,

আজ রাত্রে মোর কাছে খুলে দিয়ে স্তব্ধতার ঢাকা।

শুনিতেছি আমি এই নিঃশব্দের তলে

শূন্যে জলে স্থলে

অমনি পাখার শব্দ উদ্দাম চঞ্চল।

তৃণ দল

মাটির আকাশ-'পরে ঝাপটিছে ডানা ;

মাটির আঁধার-নিচে, কে জানে ঠিকানা,

মেলিতেছে অঙ্কুরের পাখা

লক্ষ লক্ষ বীজের বলাকা।

দেখিতেছি আমি আজি -

এই গিরিরাজি

এই বন চলিয়াছে উন্মুক্ত ডানায়

দ্বীপ হতে দ্বীপান্তরে , অজানা হইতে অজানায়।

নক্ষত্রের পাখার স্পন্দনে

চমকিছে অন্ধকার আলোর ক্রন্দনে ।।

শুনিলাম মানবের কত বাণী দলে দলে

অলক্ষিতে পথে উড়ে চলে

অস্পষ্ট অতীত হতে অস্ফুট সুদূর যুগান্তরে।

শুনিলাম আপন অন্তরে

অসংখ্য পাখির সাথে

দিনে রাতে

এই বাসাছাড়া পাখি ধায় আলো - অন্ধকারে

কোন পার হতে কোন পারে।

ধ্বনিয়া উঠিছে শূন্য নিখিলের পাখার এ গানে

'হেথা নয় অন্য কোথা , অন্য কোথা , অন্য কোনখানে !'

উমর ফারুক

– কাজী নজরুল ইসলাম

তিমির রাত্রি –‘এশা’র আজান শুনি দূর মসজিদে

প্রিয়া-হারা কান্নার মতো এ-বুকে আসিয়া বিঁধে!

আমির-উল-মুমেনিন,

তোমার স্মৃতি যে আজানের ধ্বনি – জানে না মুয়াজ্জিন!

তকবির শুনি শয্যা ছাড়িয়া চকিতে উঠিয়া বসি,

বাতায়নে চাই – উঠিয়াছে কি রে গগনে মরুর শশী?

ও-আজানা ও কি পাপিয়ার ডাক, ও কি চকোরীর গান?

মুয়াজ্জিনের কণ্ঠে ও কি ও তোমারই সে আহ্বান?

আবার লুটায়ে পড়ি!

'সেদিন গিয়াছে'–শিয়রের কাছে কহিছে কালের ঘড়ি!

উমর! ফারুক! আখেরি নবির ওগো দক্ষিণ-বাহু!

আহ্বান নয় – রূপ ধরে এসো! – গ্রাসে অন্ধতা-রাহু

ইসলাম-রবি, জ্যোতি আজ তার দিনে দিনে বিমলিন!

সত্যের আলো নিভিয়া – জ্বলিছে জোনাকির আলো ক্ষীণ!

শুধু অঙ্গুলি-হেলনে শাসন করিতে এ জগতের

দিয়াছিলে ফেলি মুহম্মদের চরণে যে-শমশের,

ফিরদৌস ছাড়ি নেমে এসো তুমি সেই শমশের ধরি,

আর একবার লোহিত-সাগরে লালে লাল হয়ে মরি!

নওশার বেশে সাজাও বন্ধু মোদের পুনর্বার

খুনের সেহেরা পরাইয়া দাও হাতে বাঁধি হাতিয়ার!

দেখাইয়াদাও – মৃত্যু যথায় রাঙা দুলহিন৬ -সাজে

করে প্রতীক্ষা আমাদের তরে রাঙা রণ-ভূমি মাঝে!

মোদের ললাট-রক্তে রাঙিবে রিক্ত সিঁথি তাহার,

দুলাব তাহার গলায় মোদের লোহু-রাঙা তরবার!

সেনানী! চাই হুকুম!

সাত সমুদ্র তেরো নদী পারে মৃত্যু-বধূর ঘুম

টুটিয়াছে ওই যক্ষ-কারায় সহে নাকো আর দেরি,

নকিব কণ্ঠে শুনবি কখন নব অভিযান ভেরি!...

নাই তুমি নাই, তাই সয়ে যায় জমানার অভিশাপ,

তোমার তখ্‌ত বসিয়া করিছে শয়তান ইনসাফ !

মোরা 'আসহাব-কাহাফের' মতো দিবানিশি দিই ঘুম,

'এশা'র আজান কেঁদে যায় শুধু – নিঃঝুম নিঃঝুম!

কত কথা মনে জাগে,

চড়ি কল্পনা-বোররাকে যাই তেরশো বছর আগে

যেদিন তোমার প্রথম উদয় রাঙা মরু-ভাস্কর,

আরব যেদিন হল আরাস্তা, মরীচিকা সুন্দর।

গোষ্ঠে বসিয়া বালক রাখাল মহম্মদ সেদিন

বারে বারে কেন হয়েছে উতলা! কোথা বেহেশ্‌ত বীণ

বাজিতেছে যেন! কে যেন আসিয়া দাঁড়িয়েছে তাঁর পিছে,

বন্ধু বলিয়া গলা জড়াইয়া কে যেন সম্ভাষিছে!

মানসে ভাসিছে ছবি –

হয়তো সেদিন বাজাইয়া বেণু মোদের বালক নবি

অকারণ সুখে নাচিয়া ফিরেছে মেষ-চরণের মাঠে!

খেলায়েছে খেলা বাজাইয়া বাঁশি মক্কার মরু বাটে!

খাইয়াছে চুমু দুম্বা শিশুরে জড়াইয়া ধরি বুকে,

উড়ায়ে দিয়েছে কবুতরগুলি আকাশে অজানা সুখে!

সূর্য যেন গো দেখিয়াছে – তার পিছনে অমারাতি

রৌশন-রাঙা করিছে কে যেন জ্বালায়ে চাঁদের বাতি।

উঠেছিল রবি আমাদের নবি, সে মহা-সৌরলোকে,

উমর, একাকী তুমি পেয়েছিলে সে আলো তোমার চোখে!

কে বুঝিবে লীলা-রসিকের খেলা! বুঝি ইঙ্গিতে তার

বেহেশ্‌ত-সাথি খেলিতে আসিলে ধারার পুনর্বার।

তোমার রাখাল-দোস্তের মেষ চরিত সুদূর গোঠে,

হেথা 'আজনান' -ময়দানে তব পরাণ ব্যথিয়া ওঠে!

কেন কার তরে এ প্রাণ-পোড়ানি নিজেই জান না বুঝি,

তোমার মাঠের উটেরা হারায়, তুমি তা দেখ না খুঁজি!

ইহারাই মাঝে বা হয়তো কখন দুঁহুঁ দোঁহা দেখেছিলে,

খেজুর-মেতির গল-হার যেন বদল করিয়া নিল,

হইলে বন্ধু মেষ-চারণের ময়দানে নিরালয়,

চকিত দেখায় চিনিল হৃদয় চির-চেনা আপনায়!

খেলার প্রভাত কাটিল কখন, ক্রমে বেলা বেড়ে চলে,

প্রভাতের মালা শুকায়ে ঝরিল খর মরু বালুতলে।

দীপ্ত জীবন মধ্যাহ্নের রৌদ্র তপ্ত পথে

প্রভাতের সখা শত্রুর বেশে আসিল রক্ত-রথে।

আরবে সেদিন ডাকিয়াছে বান, সেদিন ভূবন জুড়ি,

'হেরা'-গুহা হতে ঠিকরিয়া ছুটি মহাজ্যোতি বিচ্ছুরি!

প্রতীক্ষমাণ তাপসী ধরণি সেদিন শুদ্ধস্নাতা

উদাত্ত স্বরে গাহিতেছিল গো কোরাণের সাম-গাথা!

পাষাণের তলে ছিল এত জল, মরুভূমে এত ঢল?

সপ্ত সাগর সাতশত হয়ে যেন করে টলমল!

খোদার হাবিব এসেছে আজিকে হইয়া মানব-মিতা,

পুণ্য-প্রভায় ঝলমল করে ধরা পাপ-শঙ্কিতা।

সেদিন পাথারে উঠিল যে মৌজ তাহারে শাসন-হেতু

নির্ভীক যুবা দাঁড়াইলে আসি ধরি বিদ্রোহ-কেতু!

উদ্ধত রোষে তরবারি তব উর্দ্ধে আন্দোলিয়া

বলিলে, "রাঙাবে এ তেগ মুসলমানের রক্ত দিয়া!"

উন্মাদ বেগে চলিলে ছুটিয়া! – একী এ কী ওঠে গান?

এ কোন লোকের অমৃত মন্ত্র? কার মহা আহ্বান?

ফতেমা – তোমার সহোদরা – গাহে কোরান-অমিয়-গাথা,

এ কোন মন্ত্রে চোখে আসে জল, হায় তুমি জান না তা!

উন্মাদ-সম কেঁদে কও, "ওরে, শোনা পুন সেই বাণী!

কে শিখাল তোরে এ গান সে কোন বেহেশ্‌তে আনি

এ কী হল মোর? অভিনব এই গীতি শুনি হায় কেন

সকল অঙ্গ শিথিল হইয়া আসিছে আবেশে যেন!

কী যেন পুলক কী যেন আবেগ কেঁপে উঠি বারে বারে,

মানুষের দুঃখে এমন করিয়া কে কাঁদিছে কোন পারে?"

আশহাদু আন-লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু" বলি

কহিল ফাতেমা–"এই যে কোরান, খোদার কালাম গলি

নেমেছে ভুবনে মহম্মদের অমর কণ্ঠে, ভাই!

এই ইসলাম, আমরা ইহারই বন্যায় ভেসে যাই!"...

উমর আনিল ইমান। – গরজি গরজি উঠিল স্বর

গগন পবন মন্থর করি –“আল্লাহু আকবর!”

সম্ভ্রমে-নত বিশ্ব সেদিন গাহিল তোমার স্তব –

“এসেছেন নবি, এত দিনে এল ধরায় মহামানব!”

পয়গম্বর রবি ও রুসল – এঁরা তো খোদার দান!

তুমি রাখিয়াছ, হে অতি-মানুষ, মানুষের সম্মান!

কোরান এনেছে সত্যের বাণী, সত্যে দিয়াছে প্রাণ,

তুমি রূপ – তব মাঝে সে সত্য হয়েছে অধিষ্ঠান।

ইসলাম দিল কি দান বেদনা-পীড়িত এ ধরণিরে,

কোন নব বাণী শুনাইতে খোদা পাঠাল শেষ নবিরে, –

তোমারে হেরিয়া পেয়েছি জওয়াব সেসব জিজ্ঞাসার!

কী যে ইসলাম, হয়তো বুঝিনি, এইটুকু বুঝি তার

উমর সৃজিতে পারে যে ধর্ম, আছে তার প্রয়োজন!

ওগো, মানুষের কল্যাণ লাগি তারই শুভ আগমন

প্রতীক্ষায় এ দুঃখিনী ধরা জাগিয়াছে নিশিদিন

জরা-জর্জর সন্তানে ধরি বক্ষে শান্তিহীন!

তপস্বিনীর মতো

তাহারই আশায় সেধেছে ধরণি অশেষ দুখের ব্রত।

ইসলাম – সে তো পরশ-মাণিক তারে কে পেয়েছে খুঁজি!

পরশে তাহার সোনা হল যারা তাদেরেই মোরা বুঝি।

আজ বুঝি – কেন কেন বলিয়াছিলেন শেষ পয়গম্বর –

"মোর পরে যদি নবি হত কেউ, হত সে এক উমর!"

পাওনিকো 'ওই', হওনিকো নবি, তাইতো পরান ভরি

বন্ধু ডাকিয়া আপনার বলি বক্ষে জড়ায়ে ধরি!

খোদারে আমরা করি গো সেজদা, রসুলে করি সালাম,

ওঁরা ঊর্ধ্বের, পবিত্র হয়ে নিই তাঁহাদের নাম,

তোমারে স্মরিতে ঠেকাই না কর ললাটে ও চোখে-মুখে

প্রিয় হয়ে আছ তুমি হতমান মানুষ জাতির বুকে।

করেছ শাসন অপরাধীদের তুমি করনিকো ক্ষমা,

করেছ বিনাশ অসুন্দরের। বলনিকো মনোরমা।

মিথ্যাময়ীরে। বাঁধনিকো বাসা মাটির ঊর্ধ্বে উঠি।

তুমি খাইয়াছ দুঃখীর সাথে ভিক্ষার খুদ খুঁটি!

অর্ধ পৃথিবী করেছ শাসন ধুলার তখ্‌তে বসি

খেঁজুর পাতার প্রাসাদ তোমার বারে বারে গেছে খসি

সাইমুম-ঝড়ে। পড়েছে কুঠির, তুমি পড়নিকো নুয়ে,

ঊর্ধ্বের যারা – পড়েছে তাহারা, তুমি ছিলে খাড়া ভুঁয়ে!

শত প্রলোভন বিলাস বাসন ঐশ্বর্যের মদ

করেছে সালাম দূর হতে সব, ছুঁইতে পারেনি পদ।

সবারে ঊর্ধ্বে তুলিয়া ধরিয়া তুমিছিলে সব নিচে,

বুকে করে সবে বেড়া করি পার, আপনি রহিলে পিছে!

হেরি পশ্চাতে চাহি –

তুমি চলিয়াছ রৌদ্রদগ্ধ দূর মরুপথ বাহি

জেরুজালেমের কিল্লা যথায় আছে অবরোধ করি

বীর মুসলিম সেনা দল তব বহু দিন মাস ধরি।

দুর্গের দ্বার খুলিবে তাহারা, বলেছে শত্রু শেষে –

উমর যদি গো সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করে এসে।

হায় রে আধেক ধরার মালিক আমিরুল-মুমেনিন

শুনে সে খবর একাকী উষ্ট্রে চলেছে বিরামহীন

সাহারা পারায়ে! ঝুলিতে দুখানা শুকনো 'খবুজ' রুটি,

একটি মশকে একটুকু পানি খোর্মা দু-তিন মুঠি!

প্রহরীবিহীন সম্রাট চলে একা পথে উটে চড়ি

চলিছে একটি মাত্র ভৃত্য উষ্টের রশি ধরি!

মরুর সূর্য ঊর্ধ্ব আকাশে আগুন বৃষ্টি করে,

সে আগুন-তাতে খই সম ফোটে বালুকা মরুর পরে।

কিছুদূর যেতে উট হতে নামি কহিলে ভৃত্যে, "ভাই

পেরেশান বড়ো হয়েছে চলিয়া! এইবার আমি যাই

উষ্ট্রের রশি ধরিয়া অগ্রে, তুমি উঠে বসো উটে ;

তপ্ত বালুতে চলি যে চরণে রক্ত উঠেছে ফুটে!"

ভৃত্য দস্ত চুমি

কাঁদিয়া কহিল "উমর! কেমনে এ আদেশ করো তুমি?

উষ্ট্রের পিঠে আরাম করিয়া গোলাম রহিবে বসি

আর হেঁটে যাবে খলিফা উমর ধরি সে উটের রশি"

খলিফা হাসিয়া বলে,

"তুমি জিতে গিয়ে বড়ো হতে চাও, ভাই রে এমনই ছলে!

রোজ-কিয়ামতে আল্লা যেদিন কহিবে "উমর! ওরে,

করেনি খলিফা মুসলিম-জাঁহা তোর সুখ তরে তোরে!"

কী দিব জওয়াব, কি করিয়া মুখ দেখাব রসুলে ভাই?

আমি তোমাদের প্রতিনিধি শুধু! মোর অধিকার নাই

আরাম সুখের, – মানুষ হইয়া নিতে মানুষের সেবা!

ইসলাম বলে সকলে সমান, কে বড়ো ক্ষুদ্র কেবা!

ভৃত্য চড়িল উটের পিঠে উমর ধরিল রশি,

মানুষে স্বর্গে তুলিয়া ধরিয়া ধুলায় নামিল শশী

জানি না, সেদিন আকাশে পুষ্পবৃষ্টি হইল কিনা,

কী গান গাহিল মানুষে সেদিন বন্দি বিশ্ববাণী!

জানি না, সেদিন ফেরেশতা তব করেছে কি না স্তব, –

অনাগত কাল গিয়েছিল শুধু, "জয় জয় হে মানব!"...

আসিলে প্যালেস্টাইন, পারায়ে দুস্তর মরুভূমি,

ভৃত্য তখন উটের উপরে, রশি ধরে চল তুমি!

জর্ডন নদী হও যবে পার, শত্রুরা কহে হাঁকি –

“যার নামে কাঁপে অর্ধ পৃথিবী, এই সেই উমর নাকি?”

খুলিল রুদ্ধ দূর্গা-দুয়ার! শত্রুরা সম্ভ্রমে

কহিল –“খলিফা আসেনি, এসেছে মানুষ জেরুজালমে!”

সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করি শত্রু-গির্জা-ঘরে

বলিলে, “বাহিরে যাইতে হইবে এইবার নামাজ তরে!”

কহে পুরোহিত, “আমাদের এই আঙিনায় গির্জায়,

পড়িলে নামাজ হবে না কবুল আল্লার দরগায় ?”

হাসিয়া বলিলেন, “তার তরে নয়, আমি যদি হেথা আজ

নামাজ আদায় করি, তবে কাল অন্ধ লোক-সমাজ

ভাবিবে – খলিফা করেছে ইশারা হেথায় নামাজ পড়ি

আজ হতে যেন এই গির্জারে মোরা মসজিদ করি!

ইসলামের এ নহেকো ধর্ম, নহে খোদার বিধান,

কারও মন্দির গির্জারে করে মজিদ মুসলমান!”

কেঁদে কহে যত ইসাই ইহুদি অশ্রু সিক্ত আঁখি –

“এই যদি হয় ইসলাম – তবে কেহ রহিবেনা বাকি,

সকলে আসিবে ফিরে

গণতন্ত্রের ন্যায় সাম্যের শুভ্র এ মন্দিরে!”

তুমি নির্ভীক এ খোদা ছাড়া করনিকো কারে ভয়

সত্যব্রত তোমায় তাইতে সবে উদ্ধত কয়।

মানুষ হইয়া মানুষের পূজা মানুষরই অপমান

তাই মহাবীর খালেদেরে তুমি পাঠাইলে ফরমান

সিপাহ-সালারে ইঙ্গিতে তব করিলে মামুলি সেনা,

বিশ্ব-বিজয়ী বীরেরে শাসিতে এতটুকু টলিলে না।

ধরাধাম ছাড়ি শেষ নবী যবে করিল মহাপ্রয়াণ,

কে হবে খালিফা – হয়নি তখনও কলহের অবসান,

নব-নন্দনী বিবি ফাতেমার মহলে আসিয়া সবে

করিতে লাগিল জটলা – ইহার পরে কে খালিফা হবে!

বজ্রকণ্ঠে তুমিই সেদিন বলিতে বলিতে পারিয়াছিলে –

"নবিসূতা! তবে মহল জ্বালাব, এ সভা ভেঙে না দিলে!"

মানব-প্রেমিক! আজিকে তোমারে স্মরি,

মনে পড়ে যত মহত্ত্ব-কথা – সেদিন সে বিভাবরী

নগর-ভ্রমণে বাহিরিয়া তুমি দেখিতে পাইলে দূরে

মায়েরে ঘিরিয়া ক্ষুধাতুর দুটি শিশু সকরুণ সুরে

কাঁদিতেছে আর দুঃখিনী মাতা ছেলেরে ভুলাতে, হায়,

উনানে শূণ্য হাঁড়ি চড়াইয়া কাঁদিয়া অকূলে চায়!

শুনিয়া সকল – কাঁদিতে কাঁদিতে ছুটে গেলে মদিনাতে

বয়তুল-মাল হইতে লইয়া ঘৃত আটা নিজ হাতে,

বলিলে, "এসব চাপাইয়া দাও আর পিঠের পরে,

আমি লয়ে যাব বহিয়া এ-সব দুখিনী মায়ের ঘরে।"

কত লোক আসি আপনি চাহিল বহিতে তোমার বোঝা,

বলিলে, “বন্ধু, আমার এ ভার আমিই বহিব সোজা!

রোজ-কিয়ামতে কে বহিবে বলো আমার পাপের ভার?

মম অপরাধে ক্ষুধায় শিশুরা কাঁদিয়াছে, আজই তার

প্রায়শ্চিত্ত করিব আপনি!” – চলিলে নিশীথ রাতে

পৃষ্ঠে বহিয়া খাদ্যের বোঝা দুখিনীর আঙিনাতে

এত যে কোমল প্রাণ,

করুণার বশে তবু গো ন্যায়ের করনিকো অপমান!

মদ্যপানের অপরাধে প্রিয় পুত্ররে নিজ করে

মেরেছ দোররা, মরেছে পুত্র তোমার চোখের পরে।

ক্ষমা চাহিয়াছে পুত্র, বলেছ পাষাণে বক্ষ বাঁধি –

“অপরাধ করে তোরই মত স্বরে কাঁদিয়াছে অপরাধী!”

আবু শাহমার গোরে

কাঁদিতে যাইয়া ফিরিয়া আসি গো তোমারে সালাম করে।

খাস দরবার ভরিয়া গিয়াছে হাজার দেশের লোকে,

‘কোথায় খলিফা’ কেবলই প্রশ্ন ভাসে উৎসুক চোখে,

একটি মাত্র পিরান কাচিয়া শুকায়নি তাহা বলে

রৌদ্রে ধরিয়া বসিয়া আছে গো খলিফা আঙিনা-তলে!

… হে খলিফাতুল-মুসলেমিন! হে চীরধারী সম্রাট!

অপমান তব করিব না আজ করিয়া নান্দী পাঠ,

মানুষেরে তুমি বলেছ বন্ধু, বলিয়াছ ভাই, তাই

তোমারে এমন চোখের পানিতে স্মরি গো সর্বদাই!

বন্ধু গো, প্রিয়, এ হাত তোমারে সালাম করিতে গিয়া

ওঠে না ঊর্ধ্বে, বক্ষে তোমারে ধরে শুধু জড়াইয়া!...

মাহিনা মোহররম –

হাসেন হোসেন হয়েছে শহিদ, জানে শুধু হায় কৌম,

শহিদি বাদশা! মোহর্‌রমে যে তুমিও গিয়াছ চলি

খুনের দরিয়া সাঁতারি – এজাতি গিয়াছে গো তাহা ভুলি!

মোরা ভুলিয়াছি, তুমি তো ভোলনি! আজও আজানের মাঝে

মুয়াজ্জিনের কণ্ঠে বন্ধু, তোমারই কাঁদন বাজে

বন্ধু গো জানি, আমাদের প্রেমের আজও ও গোরের বুকে

তেমনি করিয়া কাঁদিছ হয়তো কত না গভীর দুখে!

ফিরদৌস হতে ডাকিছে বৃথাই নবি পয়গম্বর,

মাটির দুলাল মানুষের সাথে ঘুমাও মাটির পর!

হে শহিদ! বীর! এই দোয়া কর আরশের পায়া ধরি –

তোমারই মতন মরি যান হেসে খুনের সেহেরা পরি।

মৃত্যুর হতে মরিতে চাহি না, মানুষের প্রিয় করে

আঘাত খাইয়া যেন গো আমার শেষ নিঃশ্বাস পড়ে!

বনলতা সেন

জীবনানন্দ দাশ

হাজার বছর ধ’রে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে,

সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মালয় সাগরে

অনেক ঘুরেছি আমি; বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে

সেখানে ছিলাম আমি; আরো দূর অন্ধকারে বিদর্ভ নগরে;

আমি ক্লান্ত প্রাণ এক, চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন,

আমারে দু-দণ্ড শান্তি দিয়েছিলো নাটোরের বনলতা সেন।

চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা,

মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য; অতিদূর সমুদ্রের ’পর

হাল ভেঙে যে-নাবিক হারায়েছে দিশা

সবুজ ঘাসের দেশ যখন সে চোখে দেখে দারুচিনি-দ্বীপের ভিতর,

তেমনি দেখেছি তারে অন্ধকারে; বলেছে সে, ‘এতদিন কোথায় ছিলেন?’

পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন।

সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতন

সন্ধ্যা আসে; ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল;

পৃথিবীর সব রং নিভে গেলে পাণ্ডুলিপি করে আয়োজন

তখন গল্পের তরে জোনাকির রঙে ঝিলমিল;

সব পাখি ঘরে আসে— সব নদী— ফুরায় এ-জীবনের সব লেনদেন;

থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন।

মুসাফির

জসীমউদদীন

চলে মুসাফির গাহি,

এ জীবনে তার ব্যথা আছে শুধু, ব্যথার দোসর নাহি।

নয়ন ভরিয়া আছে আঁখিজল, কেহ নাই মুছাবার,

হৃদয় ভরিয়া কথার কাকলি, কেহ নাই শুনিবার।

চলে মুসাফির নির্জন পথে, দুপুরের উঁচু বেলা,

মাথার উপরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া করিছে আগুন-খেলা।

দুধারে উধাও বৈশাখ-মাঠ রৌদ্রেরে বুকে চাপি,

ফাটলে ফাটলে চৌচির হয়ে করিতেছে দাপাদাপি।

নাচে উলঙ্গ দমকা বাতাস ধূলার বসন ছিঁড়ে,

ফুঁদিয়ে ফুঁদিয়ে আগুন জ্বালায় মাঠের ঢেলারে ঘিরে।

দুর পানে চাহি হাঁকে মুসাফির, আয়, আয়, আয়, আয়,

কম্পন জাগে খর দুপুরের আগুনের হলকায়।

তারি তালে তালে দুলে দুলে উঠে দুধারের স্তব্ধতা,

হেলে নীলাকাশ দিগন্তে- বেড়ি বাঁকা বনরেখা-লতা।

চলে মুসাফির দুর দুরাশার জনহীন পথ পাড়ি,

বুকে করাঘাত হানিয়া সে যেন কি ব্যথা দেখাবে ফাড়ি।

নামে দিগন্তে- দুপুরের বেলা, আসে এলোকেশী রাতি,

গলায় তাহার শত তারকার মুন্ডমালার বাতি।

মেঘের খাঁড়ায় রবিরে বনিয়া নাচে সে ভয়ঙ্করী,

দুর পশ্চিমে নিহত দিনের ছিন্নমুন্ড ধরি।

রুধির লেখায় দিগন্ত বায় লোল সে রসনা মেলি,

হাসে দিগন্তে- মত্ত ডাকিনী করিয়া রক্ত-কেলি।

চলেছে পথিক-চলেছে সে তার ভয়ঙ্করের পথে,

বেদনা তাহার সাথে সাথে চলে সুরের ইন্দ্ররথে।

ঘরে ঘরে জ্বলে সন্ধ্যার দীপ, মন্দিরে বাজে শাঁখ,

গাঁয়ের ভগ্ন মসজিদে বসি ডাকে দুটো দাঁড়কাক।

কবরে বসিয়া মাথা কুটে কাঁদে কার বিরহিনী মাতা,

চলেছে পথিক আপনার মনে বকিয়া বকিয়া যা-তা।

চলেছে পথিক-চলেছে পথিক-কতদুর-কতদুর,

আর কতদুর গেলে পরে সে যে পাবে দেখা বন্ধুর।

কেউ কি তাহার আশাপথ চাহি গণেছে বয়ষ মাস,

ধুঁয়ার ছলায় কাঁদিয়া কি কেউ ভিজায়েছে বেশবাস?

কিউ কি তাহারে দেখায়েছে দীপ কানো গেঁয়ো ঘর হতে,

মাথার কেশেতে পাঠায়েছে লেখা গংকিণী নদী সোঁতে?

চলেছে পথিক চলেছে সে তার ললাটের লেখা পড়ি,

সীমালেখাহীন পথ-মায়াবীর অঞ্চলখানি ধরি।

ঘরে ঘরে ওঠে মৃদু কোলাহল, বঁধুরা বধুর গলে,

বাহুর লতায় বাহুরে বাঁধিয়া প্রণয়-দোলায় দোলে।

বাঁশী বাজে দুরে সুখ-রজনীর মদিরা-সুবাস ঢালি,

দীঘির মুকুরে হেরে মুখ রাত চাঁদের প্রদীপ জ্বালি।

নতুন বধুর বক্ষে জড়ায়ে কচি শিশু বাহু তুলি,

হাসিয়া হাসিয়া ছড়াইছে যেন মণি-মানিকের ধুলি।

চলেছে পথিক-রহিয়া রহিয়া করিছে আর্তনাদ-

ও যেন ধরার সকল সুখের জীবন- প্রতিবাদ।

রে পথিক ! বল, কারে তুই চাস, যে তোরে এমন করে,

কাঁদাইল হায়, কেমন করিয়া রহিল সে আজ ঘরে?

কোন ছায়া-পথ নীহারিকা পারে, দেখেছিলি তুই কারে,

কোন সে কথার মানিক পাইয়া বিকাইলি আপনারে ।

কার গেহ ছায়ে শুনেছিলি তুই চুড়ির রিণিকি-ঝিনি,

কে তোর ঘাটেতে এসেছিল ঘট বুড়াইতে একাকিনী ।

চলে মুসাফির আপনার রাহে কোন দিকে নাহি চায়,

দূর বনপথে থাকিয়া থাকিয়া রাত-জাগা পাখি গায়।

গগনের পথে চাঁদেরে বেড়িয়া ডাকে পিউ, পিউ কাঁহা,

সে মৌন চাঁদ আজো হাসিতেছে, বলিল না, উহু আহা।

বউ কথা কও-বউ কথা কও-কতকাল -কতকাল,

রে উদাস, বল আর কতকাল পাতিবি সুরের জাল।

সে নিঠুর আজো কহিল না কথা, রহস্য-যবনিকা

খুলিয়া আজিও পরাল না কারো ললাটে প্রণয় টীকা।

চলেছে পথিক চলেছে সে তার দূর দুরাশার পারে,

কোনো পথবাঁকে পিছু ডাকে আজ ফিরাল না কেউ তারে।

চলেছে পথিক চলেছে সে যেন মৃত্যুর মত ধীরে,

যেন জীবন- হাহাকার আজি কাঁদিছে তাহার ঘিরে।

চারিদিক হতে গ্রাসিয়াছে তারে নিদারুণ আন্ধার,

স্তব্ধতা যেন জমাট বেঁধেছে ক্রন্দন শুনি তার।

স্বাধীনতা তুমি

শামসুর রহমান

স্বাধীনতা তুমি

রবিঠাকুরের অজর কবিতা, অবিনাশী গান।

স্বাধীনতা তুমি

কাজী নজরুল ঝাঁকড়া চুলের বাবরি দোলানো

মহান পুরুষ, সৃষ্টিসুখের উল্লাসে কাঁপা-

স্বাধীনতা তুমি

শহীদ মিনারে অমর একুশে ফেব্রুয়ারির উজ্জ্বল সভা

স্বাধীনতা তুমি

পতাকা-শোভিত শ্লোগান-মুখর ঝাঁঝালো মিছিল।

স্বাধীনতা তুমি

ফসলের মাঠে কৃষকের হাসি।

স্বাধীনতা তুমি

রোদেলা দুপুরে মধ্যপুকুরে গ্রাম্য মেয়ের অবাধ সাঁতার।

স্বাধীনতা তুমি

মজুর যুবার রোদে ঝলসিত দক্ষ বাহুর গ্রন্থিল পেশী।

স্বাধীনতা তুমি

অন্ধকারের খাঁ খাঁ সীমান্তে মুক্তিসেনার চোখের ঝিলিক।

স্বাধীনতা তুমি

বটের ছায়ায় তরুণ মেধাবী শিক্ষার্থীর

শানিত কথার ঝলসানি-লাগা সতেজ ভাষণ।

স্বাধীনতা তুমি

চা-খানায় আর মাঠে-ময়দানে ঝোড়ো সংলাপ।

স্বাধীনতা তুমি

কালবোশেখীর দিগন্তজোড়া মত্ত ঝাপটা।

স্বাধীনতা তুমি

শ্রাবণে অকূল মেঘনার বুক

স্বাধীনতা তুমি পিতার কোমল জায়নামাজের উদার জমিন।

স্বাধীনতা তুমি

উঠানে ছড়ানো মায়ের শুভ্র শাড়ির কাঁপন।

স্বাধীনতা তুমি

বোনের হাতের নম্র পাতায় মেহেদীর রঙ।

স্বাধীনতা তুমি বন্ধুর হাতে তারার মতন জ্বলজ্বলে এক রাঙা পোস্টার।

স্বাধীনতা তুমি

গৃহিণীর ঘন খোলা কালো চুল,

হাওয়ায় হাওয়ায় বুনো উদ্দাম।

স্বাধীনতা তুমি

খোকার গায়ের রঙিন কোর্তা,

খুকীর অমন তুলতুলে গালে

রৌদ্রের খেলা।

স্বাধীনতা তুমি

বাগানের ঘর, কোকিলের গান,

বয়েসী বটের ঝিলিমিলি পাতা,

যেমন ইচ্ছে লেখার আমার কবিতার খাতা।

আমার পূর্ব বাংলা

সৈয়দ আলী আহসান

আমার পূর্ব–বাংলা একগুচ্ছ স্নিগ্ধ

অন্ধকারের তমাল

অনেক পাতার ঘনিষ্ঠতায়

একটি প্রগাঢ় নিকুঞ্জ

সন্ধ্যার উন্মেষের মতো

সরোবরে অতলের মতো

কালো–কেশ মেঘের সঞ্চয়ের মতো

বিমুগ্ধ বেদনার শান্তি

আমার পূর্ব–বাংলা বর্ষার অন্ধকারে

অনুরাগ

হৃদয় ছুঁয়ে–যাওয়া

সিক্ত নীলাম্বরী

নিকুঞ্জের তমাল কনক–লতায় ঘেরা

কবরী এলো করে আকাশ দেখার

মুহূর্ত

অশেষ অনুভূতি নিয়ে

পুলকিত সচ্ছলতা

এক সময় সূর্যকে ঢেকে

অনেক মেঘের পালক

রাশি রাশি ধান মাটি আর পানির

কেমন নিশ্চেতন করা গন্ধ

কত দশা বিরহিণীর—এক দুই তিন

দশটি

এখানে ত্রস্ত আকুলতায় চিরকাল

ঘর আর বিদেশ আঙিনা

আকুলতায় একাকার

অভিসার

তিনটি ফুল আর অনেক পাতা নিয়ে

কদম্ব তরুর একটি শাখা মাটি

ছুঁয়েছে

আরও অনেক গাছ পাতা লতা

নীল হলুদ বেগুনী অথবা সাদা

অজস্র ফুলের বন্য অফুরন্ত

ঘুমের অলসতায় চোখ বুজে আসার মতো

শান্তি

কাকের চোখের মতো কালোচুল

এলিয়ে

পানিতে পা ডুবিয়ে—রাঙা–উৎপল

যা'র উপমা

হৃদয় ছুঁয়ে–যাওয়া সিক্ত নীলাম্বরীতে

দেহ ঘিরে

যে দেহের উপমা স্নিগ্ধ তমাল—

তুমি আমার পূর্ব–বাংলা

পুলকিত সচ্ছলতায় প্রগাঢ় নিকুঞ্জ।।